আমার বাংলা বই

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

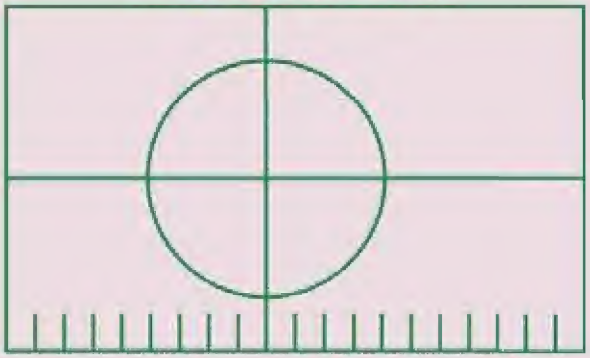

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি X ১৮৩ সেমি (১০' X ৬')

১৫২ সেমি X ৯১ সেমি (৫' X ৩')

৭৬ সেমি X ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}$' X $১\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

তৃতীয় শ্রেণি

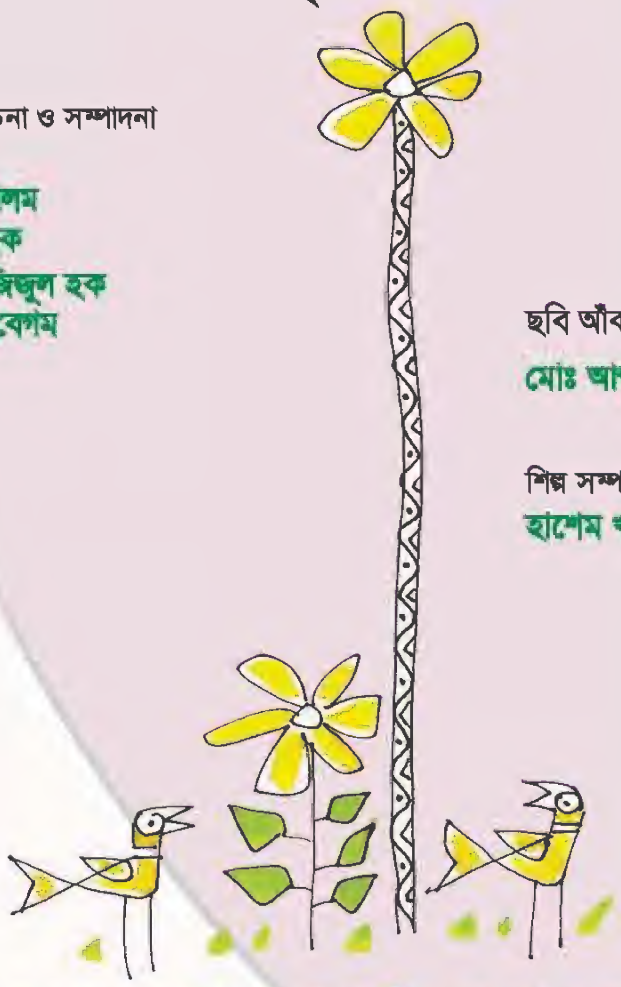

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

শফিউল আলম
মাহবুবুল হক
সৈয়দ আজিজুল হক
নূরজাহান বেগম

ছবি আঁকা ও শিল্প সম্পাদনা
মোঃ আব্দুল মোমেন মিন্টন

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : ২০১২

সমন্বয়ক
উত্তম কুমার ধর

গ্রাফিক্স
মোঃ আবুল হোসেন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময় । তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই । শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ । শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা। ফলে বাংলা শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই **তৃতীয় শ্রেণির** বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীকে শিখনে আগ্রহী করা ও নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকটি পরিকল্পিত হয়েছে। এতে জীবন ও পরিবেশভিত্তিক এবং যুগের চাহিদার অনুকূল সহজ পাঠ প্রণয়ন করে সংগতিপূর্ণ চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠকে যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয় পাঠের মাধ্যমে নিত্য-নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থী যেন তার শব্দভাণ্ডার ও ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে সেদিকটিও যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ছবি ও কথা	০১
২	হাটে যাব	০৬
৩	রাজা ও তাঁর তিন কন্যা	০৮
৪	আমাদের এই বাংলাদেশ	১৫
৫	ভাষা শহিদদের কথা	১৮
৬	চল্ চল্ চল্	২৫
৭	স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে	২৯
৮	কুঁজো বুড়ির গল্প	৩৭
৯	তালগাছ	৪৩
১০	একাই একটি দুর্গ	৪৬
১১	আমার পণ	৫২
১২	পাখপাখালির কথা	৫৬
১৩	আমাদের গ্রাম	৬৪
১৪	কানামাছি ভোঁ ভোঁ	৬৭
১৫	আদর্শ ছেলে	৭২
১৬	একজন পটুয়ার কথা	৭৬
১৭	ঘুড়ি	৮৩
১৮	স্টিমারের সিটি	৮৬
১৯	পাল্লা দেওয়ার খবর	৯৩
২০	বড় কে ?	৯৬
২১	নিরাপদে চলাচল	৯৯

ছবি ও কথা

আমাদের বন্ধুরা

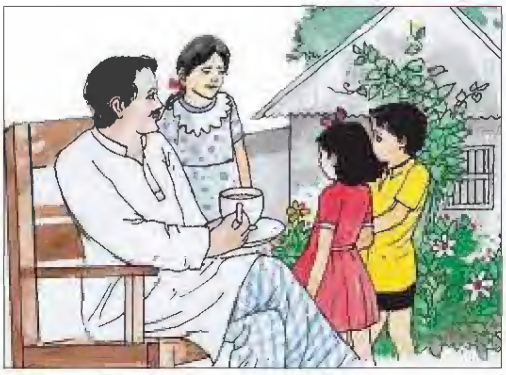

পলাশ ও সীমা এসেছে খালার বাড়ি। খালু রফিক সাহেব উঠোনে বসে চা পান করছিলেন। মেয়ে রেজিনা সেখানে এলো। বলল, আব্বু, ওদের তো খেত দেখানোর কথা। তিনি বললেন, তোমরা এগোও। আমি আসছি।

রেজিনা ওদের নিয়ে বাড়ির পাশের খেতে গেল। সেখানে উঁচু ভিটিতে এক ফালি জমি। এক দিকে লাউ আর শিমের মাচা। অন্য দিকে বেগুন ও টমেটোর খেত।

মাচায় ঝুলছে লাউ। সবুজ পাতার মধ্যে লম্বা ডাঁটার মাথায় দুলছে সাদা ফুল। চড়ুই, শালিক ঠোঁট দিয়ে মধু খাচ্ছে ফুল থেকে। আরও কিছু পাখি উড়ছে, বসছে।

বেগুনখেতও ফুলে ভরা। টুনটুনি পাখিরা মধু খাচ্ছে। নাচানাচি করছে এগাছে ওগাছে। হলুদ, সাদা প্রজাপতি আর লাল ফড়িংও ওড়াওড়ি করছে।

পলাশ, সীমা যেমন অবাক, তেমনি খুশি। বলল, পাখিরা কীটপতঙ্গ খায়, না মধু খায়? রফিক সাহেব বললেন, পাখিরা কীটপতঙ্গ খায় ঠিকই। তবে অনেক পাখি মধুও ভালোবাসে।

ভিটির সীমানায় কয়েকটি আমগাছ। সেগুলোতে মুকুল ধরেছে। সেখানে মৌমাছি মধু খাচ্ছে। একটা গাছের ডালে বড় একটা মৌচাক। রফিক সাহেব বললেন, মৌমাছি, পিঁপড়ে, পাখিরা কিন্তু গাছের উপকার করে।

মধু খাওয়ার সময় পাখি, পিঁপড়ে, মৌমাছিরা ফুলে ফুলে ঘোরে। তখন তাদের ঠোঁটে, ডানায়, পায়ে ফুলের রেণু লেগে যায়। ওই রেণু নতুন ফুলের রেণুর সঙ্গে মেলে। তাই গাছে ফল ধরে।

তোমরা খেয়াল করে দেখো। গাছে প্রথমে ফুল ধরে। পরে হয় ফল। আমগাছে এখন মুকুল আছে। কিছুদিন পরে এগুলো আমের গুটিতে পরিণত হবে।

সবাই তখন গেল ফলবাগানের দিকে। পলাশ বলল, গাছ, পাখি ও প্রজাপতিদের মধ্যে তো খুব বন্ধুত্ব। রফিক সাহেব বললেন, গাছ কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। একটু ভেবে দেখতো কীভাবে ?

সীমা খুশিতে হাততালি দিল। বলল, হ্যাঁ খালুজান, বুঝেছি। আমরা তো গাছ থেকে কত রকমের খাবার পাই। খড়ি আর কাঠও পাই।

রফিক সাহেব বললেন, ঠিক বলেছ। তবে সবচেয়ে কাজের একটা জিনিস পাই গাছ থেকে। সেটা হচ্ছে অক্সিজেন। অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচি না।

সীমা ও পলাশ খুব অবাক হলো। বাগানের গাছগুলোর দিকে বড় বড় চোখে তাকাল তারা। শাখাগুলো দুলছে। পাখি, মৌমাছি উড়ছে, বসছে। সবাই যেন সকলের কত আপনজন। রেজিনা বলল, ঠিক আমাদের মতো।

পাঠ শিখি

ছবি দেখি। ছবি নিয়ে ভাবি। বাক্য বলি ও খাতায় লিখি।

ছড়া

হাটে যাব

আহসান হাবীব

হাটে যাব হাটে যাব ঘাটে নেই নাও
নিঘাটা নায়ের মাঝি আমায় নিয়ে যাও।
নিয়ে যাব নিয়ে যাব কত কড়ি দেবে,
কড়ি নেই কড়া নেই আর কিবা নেবে ?
সোনা মুখে সোনা হাসি তার কিছু দিও।
হাসিটুকু নিও আর খুশিটুকু নিও।

পাঠ শিখি

১. অর্থ জেনে নিই।

নিঘাটা – যেখানে ঘাট নেই। যেখানে নৌকা ভিড়ানোর জায়গা নেই।
কড়ি নেই কড়া নেই – টাকাপয়সা নেই।

২. ছড়াটি মুখে মুখে বলি।

৩. আমার জানা আর একটি ছড়া বলি।

রাজা ও তাঁর তিন কন্যা

অনেক অনেক দিন আগের কথা।

এক ছিল রাজা। রাজার ছিল এক রানি। আর ছিল তিন কন্যা। শিমুল, বকুল ও পারুল।

তিন কন্যাকে নিয়ে রাজা রানির দিন বেশ সুখেই কাটছিল। রাজ্যেও ছিল সুখ আর শান্তি।

রাজা একদিন গল্প করছিলেন। সঙ্গে ছিল রানি আর তিন কন্যা। রাজা তাঁর কন্যাদের জিজ্ঞেস করলেন, এক সহজ প্রশ্ন। কে তাঁকে কী রকম ভালোবাসে।

বড় কন্যা শিমুল। সেই জবাব দিল প্রথমে। বলল, বাবা, আমি তোমাকে চিনির মতো ভালোবাসি। রাজা একটু মুচকি হাসলেন।

মেঝো কন্যা বকুল বলল, বাবা, আমি তোমাকে মিষ্টির মতো ভালোবাসি। রাজার মুখে আবার দেখা গেল হাসির রেখা।

ছোট কন্যা পারুল। বলল, বাবা, আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি। সঙ্গে সঙ্গে রাজার মুখ হয়ে গেল কালো। রানিও শুনে অবাক। এ কেমন কথা। রাজা বেশ অস্থির। ডাকলেন উজির নাজির সেনাপতিকে।

হুকুম দিলেন, ছোট কন্যা পারুলকে গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসো। বনবাসে দাও তাকে।

রাজার হুকুম বলে কথা। না মেনে উপায় নেই। পরদিন পারুলকে পাঠানো হলো বনবাসে। গভীর অরণ্য, জনপ্রাণী নেই। পারুলের দুঃখের কথা পরিরা বুঝতে পারল। রাজার মেয়ে পারুলের জন্য তারা সুন্দর একটা বাড়ি তৈরি করল। পরিরা নানা ফুলের চারা এনে একটা বাগান বানাল। বনের পশুপাখি এলো রাজার মেয়েকে দেখতে। হরিণ এলো, খরগোশ এলো, ময়ূর এলো। তারা রাজার ছোট মেয়ে পারুলের দুঃখ বুঝতে পারল। তারা পারুলের জন্য এনে দিল নানা ফলমূল। পরিরা এনে দিল মজার মজার খাবার।

গভীর অরণ্যে পারুলের দিন কাটতে লাগল একা একা। মনে তার অনেক দুঃখ। মা নেই। বাবা নেই। বোনেরা নেই।

একদিন রাজার খেয়াল হলো শিকারে যাবেন। রাজার খেয়াল মানে সহজ কথা নয়। উজির নাজির পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বেরোলেন শিকারে। শিকারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলেন গভীর অরণ্যে। রাজা তখন খুবই ক্ষুধার্ত।

দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। সবাই দূরে দেখতে পেল একটি সুন্দর কুটির। সেখানে পৌঁছলেন তারা। সে কুটিরে বাস করে এক সুন্দরী কন্যা। রাজার লোকেরা তাকে বলল, বনে এসেছেন এক রাজা। তিনি ক্ষুধার্ত। তিনি খাবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। পারুল বলল, ঠিক আছে। আপনারা একটু জিরিয়ে নিন। আমি এক্ষুনি রান্নার ব্যবস্থা করছি। হাজার হলেও পারুল তো রাজার মেয়ে। সে রান্না করল কোরমা পোলাও মাংস। নানা রকমের তরকারি। কিন্তু কোনো কিছুতে একটুও নুন দিল না। পারুলের রান্নাবান্নায় সাহায্য করল পরিরা। এত রকমের সাজানো খাবার দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। তাঁর জিবে এলো জল। রাজা অধীর আগ্রহে খেতে বসলেন। খাওয়া শুরু করলেন। এটা নেন ওটা নেন। মুখে দিয়ে ফেলে দেন। এত সুন্দর রান্না। কিন্তু বেজায় বিস্বাদ। একটুও নুন নেই কোনো খাবারে। রাজা খুব বিরক্ত হলেন। নুন ছাড়া কি কিছু খাওয়া যায়? প্রশ্ন করলেন তিনি। পারুল ছিল কাছেই। সে এগিয়ে এলো। বলল, বাবা, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমার নাম পারুল। আপনার ছোট কন্যা। আপনি যাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। আমিই বলেছিলাম, আপনাকে আমি নুনের মতো ভালোবাসি।

রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। নিজের আদরের মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর নুন দিয়ে রাঁধা হলো সব খাবার। রাজা মজা করে খেলেন।

এবার ফেরার পালা। রাজা ছোট কন্যা পারুলকে হাওদায় বসালেন। তারপর হাতিঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হলেন। আনন্দের বাদ্য বাজতে লাগল। পারুল ফিরে আসায় রাজ্যে সবার মুখে হাসি ফুটল। রানি খুশি হলেন। শিমুল, বকুল তাদের বোন পারুলকে ফিরে পেল।

রাজা, রানি ও তাঁর তিন কন্যার সুখের সীমা রইল না।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

জবাব	– উত্তর।	তার কথার জবাব দিলাম।
হাসির রেখা	– হাসির চিহ্ন।	দাদুর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।
অস্থির	– চঞ্চল।	বিপদে অস্থির হওয়া ভালো নয়।
হুকুম	– আদেশ।	বাবা কাজটা করতে হুকুম দিলেন।
বনবাসে	– বনে বাস করার জন্য পাঠানো। এক ধরনের শাস্তি ।	রাজা মেয়েকে বনবাসে পাঠালেন।
অরণ্য	– গাছপালায় ভরা বন জঙ্গল।	অরণ্যে থাকে হাতি সিংহ আর নানা প্রাণী।
জনপ্রাণী	– মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী।	চাঁদে কোনো জনপ্রাণী নেই।
খেয়াল	– ইচ্ছে।	সে মনের খেয়ালে কাজটি করেছে।
উজির	– মন্ত্রী।	রাজার ছিলেন এক উজির।
নাজির	– রাজার কর্মচারী।	নাজির কাজ করেন রাজ দরবারে।
পাইক	– লাঠিয়াল। পেয়াদা।	জমিদারের অনেক পাইক ছিল।
বরকন্দাজ	– যে সেপাইয়ের সঙ্গে বন্দুক থাকে।	বরকন্দাজরা জমিদার বাড়ি পাহারা দিত।
জিরিয়ে	– বিশ্রাম করে।	একটু জিরিয়ে আমরা আবার হাঁটতে লাগলাম।
বেজায়	– খুব বেশি।	এ বছর বেজায় শীত পড়েছে।
বিস্বাদ	– কোনো স্বাদ নেই।	এ খাবার খেতে একেবারে বিস্বাদ ।
প্রচণ্ড	– ভয়ানক।	প্রচণ্ড ঝড়ে অনেক ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে।
হাওদা	– হাতির পিঠে বসার আসন	রাজা পারুলকে হাওদায় বসালেন।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত নতুন শব্দ পড়ি।

কন্যা	–	ন্য	=	ন	+	য–ফলা (্য)	বন্য, বন্যা
শান্তি	–	ন্ত	=	ন	+	ত	অন্ত, ডুবন্ত
দ্বিতীয়	–	দ্ব	=	দ	+	ব	দ্বার, দ্বিত্ব
বরকন্দাজ	–	ন্দ	=	ন	+	দ	ছন্দ, খন্দ
প্রাণী	–	প্র	=	প	+	র–ফলা (্র)	প্রথম, প্রাণ
ক্ষুধার্ত	–	ক্ষ	=	ক	+	ষ	ক্ষমা, ক্ষণ
রান্না	–	ন্ন	=	ন	+	ন	কান্না, পান্না
সাহায্য	–	য্য	=	য	+	য–ফলা (্য)	ন্যায্য
বাদ্য	–	দ্য	=	দ	+	য–ফলা (্য)	গদ্য, পদ্য

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) রাজাকে কে কীরকম ভালোবাসে – সে প্রশ্নের উত্তরে প্রথম কন্যা কী বলল ?

১) আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি।
২) আমি তোমাকে মিষ্টির মতো ভালোবাসি।
৩) আমি তোমাকে চিনির মতো ভালোবাসি।
৪) আমি তোমাকে গুড়ের মতো ভালোবাসি।

(খ) রাজার ছোট মেয়েকে বনের মধ্যে কারা বাড়ি বানিয়ে দিল ?

১) রাজার লোকেরা
২) বনের পরিরা
৩) বনের পশুরা
৪) বনের পাখিরা

(গ) আমাকে চিনতে পেরেছেন ? রাজাকে এ প্রশ্ন কে করল ?

১) শিমুল
২) বকুল
৩) পারুল
৪) রানি

(ঘ) রাজা খুব খুশি হলেন কেন ?

১) সাজানো খাবার দেখে
২) ছোট মেয়েকে দেখে
৩) শিকার করতে এসে
৪) নানা ফলমূল খেয়ে

৪. শূন্যস্থান পূরণ করি ।

(ক) বকুল বলল, আমি তোমাকে ———————— মতো ভালোবাসি।
(খ) রাজা একটু ———————— হাসলেন।
(গ) পারুলকে পাঠানো হলো ———————— ।
(ঘ) ———————— বাদ্য বাজতে লাগল।

৫. মুখে মুখে উত্তর বলি।

(ক) শিমুল বকুল পারুল – এদের পরিচয় কী ?
(খ) মেয়েদের কাছে রাজার প্রশ্নটা কী ছিল ?
(গ) শিমুল ও বকুলের উত্তর শুনে রাজার কেমন লাগল ?
(ঘ) তোমাকে আমি নুনের মতো ভালোবাসি। একথা কে বলেছিল ?
(ঙ) রাজা ছোট কন্যাকে কী করলেন ?
(চ) বনে রাজার মেয়েকে কারা ফলমূল এনে দিল ?
(ছ) রাজা বনে গিয়েছিলেন কী জন্য ?
(জ) রাজার খাবার ব্যবস্থা করল কে ?
(ঝ) খাবার মুখে দিয়ে রাজা রাগ করলেন কেন ?
(ঞ)তিনি কীভাবে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ?
(ট) রাজার রাজ্যে আবার সুখ এলো কেন ?

৬. উত্তরগুলো লিখি।

(ক) কার উত্তর শুনে রাজার মুখ কালো হয়ে গেল?
(খ) রাজা কী হুকুম দিলেন ?
(গ) বনবাস বলতে কী বোঝায় ?
(ঘ) পারুলের সঙ্গে দেখা করতে কারা এলো?
(ঙ) পারুল রাজ্যে ফিরে আসায় কারা খুশি হলো ?
(চ) আমার জানা কয়টি ফুলের নাম লিখি।
(ছ) কী না দেওয়ায় খাবার বিস্বাদ হয়েছিল?

৭. কথাগুলোর উত্তর জেনে নিই।

(ক) উজির শব্দের বদলে আমরা এখন কোন শব্দ ব্যবহার করি ?

উত্তর : মন্ত্রী।

(খ) পাইক শব্দের বদলে আমরা এখন কী বলি ?

উত্তর : সৈন্য।

(গ) হুকুম শব্দের মতো একই রকম আর কী কী শব্দ আছে?

উত্তর : আদেশ, নির্দেশ।

৮. নাম বোঝানো শব্দ জেনে নিই।

(ক) পশুর নাম – হরিণ, খরগোশ।

(খ) খাবারের নাম – নুন, চিনি, গুড়।

এভাবে দুটি পাখি ও দুটি ফলের নাম লিখি।

৯. গল্পটি মুখে মুখে বলি।

আমাদের এই বাংলাদেশ

সৈয়দ শামসুল হক

সূর্য ওঠার পূর্বদেশ
বাংলাদেশ।
আমার প্রিয় আপন দেশ
বাংলাদেশ।
আমাদের এই বাংলাদেশ।

কবির দেশ বীরের দেশ
আমার দেশ স্বাধীন দেশ
বাংলাদেশ।
ধানের দেশ গানের দেশ
তেরো শত নদীর দেশ
বাংলাদেশ।
আমার ভাষা বাংলা ভাষা
মা শেখালেন মাতৃভাষা
মিষ্টি বেশ।
মনের ভাষা জনের ভাষা
এই ভাষাতে ভালোবাসা
মায়ের দেশ।
বাংলাদেশ
আমাদের এই বাংলাদেশ।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলো জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

পূর্বদেশ	– পূর্ব দিকে আছে এমন দেশ।	পূর্বদেশে সূর্য ওঠে।
প্রিয়	– পছন্দ করা হয় এমন।	আমার প্রিয় ফুল গোলাপ।
আপন	– নিজ।	আমরা সবাই আপন আপন কাজ করি।
কবি	– যিনি কবিতা লেখেন।	নজরুল আমাদের জাতীয় কবি।
বীর	– বলবান ও সাহসী।	বাংলাদেশ অনেক বীরের জন্মভূমি।
স্বাধীন	– মুক্ত।	আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ।
জন	– সাধারণ মানুষ	জনের কল্যাণের জন্য কাজ করব।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

সূর্য	– র্য	=	রেফ (´) + য	কার্য , ধৈর্য
পূর্ব	– র্ব	=	রেফ (´) + ব	গর্ব, সর্ব
স্বাধীন	– স্ব	=	স + ব–ফলা	স্বর, স্বদেশ
মিষ্টি	– ষ্ট	=	ষ + ট	কষ্ট, চেষ্টা

জেনে রাখি।

ব্যঞ্জনবর্ণে র যুক্ত হলে তা রেফ চিহ্ন (´) হয়ে যায়। রেফ ঐ বর্ণের মাথায় বসে।

উদাহরণ :

সূর্য	– র্য	= রেফ (´)	+	য
পূর্ব	– র্ব	= রেফ (´)	+	ব

এ রকম আরও শব্দ জেনে নিই।

বর্ণ, গর্ত, আর্ট, বোর্ড

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) বাংলাদেশ কত নদীর দেশ ?

১) এগারো শত ২) বারো শত

৩) তেরো শত ৪) চৌদ্দ শত

(খ) জনের ভাষা বলতে কবি কোনটিকে বুঝিয়েছেন ?

১) মিষ্টি বাংলা ভাষা　　২) মায়ের মুখের ভাষা
৩) সাধারণ মানুষের ভাষা　　৪) মানুষের মনের ভাষা

(গ) বাংলা কাদের মাতৃভাষা?

১) সকল দেশবাসীর　　২) সকলের মায়ের
৩) সকল কবির　　৪) সকল বাঙালির

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) সূর্য ওঠার পূর্বদেশ কোনটি ?
(খ) কোন দেশ বীরের দেশ ?
(গ) কোন দেশ নদীর দেশ ?
(ঘ) কে মাতৃভাষা শেখালেন ?
(ঙ) মায়ের ভাষাকে মিষ্টি বলা হয়েছে কেন ?

৫. ডান দিকের প্রতি সারিতে দুটি করে কথা আছে। কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে বাম দিকের খালি জায়গা পূরণ করি।

(ক) আমার প্রিয় ——— ———	স্বাধীন দেশ / আপন দেশ
(খ) কবির দেশ ——— ———	বীরের দেশ / নদীর দেশ
(গ) সূর্য ওঠার ———————	বাংলাদেশ / পূর্বদেশ
(ঘ) মনের ভাষা ——— ———	বাংলা ভাষা / জনের ভাষা
(ঙ) মা শেখালেন ———————	মাতৃভাষা / ভালোবাসা

৬. কবিতাটি সবাই মিলে এক সঙ্গে জোরে জোরে পড়ি।

৭. কবিতাটি না দেখে লিখি।

৮. বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

ভাষা শহিদদের কথা

ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ। ১৯৫২ সাল। ফাল্গুন মাস। বসন্তকাল। কোনো কোনো গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে। কিছু কিছু গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। পলাশ ফুল ফুটেছে। বাগানে গাঁদা ও ডালিয়া ফুটে আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। চারদিকে কেমন থমথমে ভাব। পুলিশ মিছিল করতে নিষেধ করেছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছাত্রদের। পাকিস্তান সরকার সে দাবি মানছে না। তারা চায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। বাঙালির মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে। তাই পুলিশ চারজনের বেশি লোককে জড়ো হতে দিচ্ছে না। কিন্তু ছাত্র ও জনতা তা মানবে না। তারা মিছিল করবে। শোনা গেল, পুলিশ মিছিলে গুলি করতে পারে। কিন্তু টগবগে তরুণরা বেপরোয়া। তারা জীবন দেবে কিন্তু মায়ের ভাষার দাবি ছাড়বে না।

মিছিল বের হলো। পুলিশ গুলি করল। গুলিতে নিহত হলো অনেকে। রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এরকম অনেক নাম। তাঁরা আমাদের ভাষাশহিদ।

আবুল বরকত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওই দিন পড়ায় মন বসেনি তাঁর। পড়ার টেবিল ছেড়ে ভাষার দাবিতে তিনি ছুটে এসেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন মিছিলে। এক সময় তাঁর গায়ে গুলি লাগল। বন্ধুরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন। ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হলো না। কারণ, গুলিতে তাঁর শরীরের অনেক রক্ত ঝরে গিয়েছিল। রাতেই তিনি মারা গেলেন।

আরেকজন ভাষাশহিদের নাম রফিকউদ্দিন আহমদ। তাঁর বাড়ি মানিকগঞ্জে। কলেজের লেখাপড়া শেষ না করে এসেছিলেন ঢাকায়। বাবার ব্যবসায়ে সাহায্য করতে। ঢাকায় বাদামতলিতে ছিল তাঁর বাবার ব্যবসায়। কিন্তু ওই দিন তাঁর তরুণ মন ব্যবসায়ে আটকে থাকেনি। তিনিও ভাষার দাবিতে ছুটে এসেছিলেন। ছাত্রজনতার মিছিলে তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশের গুলি এসে তাঁর মাথায় লাগে। মাথার খুলি উড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান।

আরেক শহিদ আবদুল জব্বার। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে তাঁর বাড়ি। গরিব পরিবারের সন্তান তিনি। ফলে লেখাপড়ায় বেশি দূর এগোতে পারেননি। অল্পবয়সেই বাবার কৃষিকাজে সহায়তা করতেন। এক সময় চাকরি নিয়ে চলে যান বিদেশে। অনেক দিন পর দেশে ফেরেন। বিয়ে করেন। পিতাও হন এক সন্তানের। ঢাকা এসেছিলেন অসুস্থ শাশুড়ির চিকিৎসার জন্য। ভাষার জন্য তাঁরও প্রাণ কেঁদেছিল।

বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা। সেই ভাষার দাবিতে তিনি মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের কথা চিন্তা করে ভুলে গিয়েছিলেন অসুস্থ শাশুড়ির কথা। পুলিশের গুলি এসে লেগেছিল তাঁর শরীরে। সবাই ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। কিন্তু ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। রাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আরেক ভাষাশহিদের নাম আবদুস সালাম। নোয়াখালি জেলায় তাঁর বাড়ি। তিনি ঢাকায় চাকরি করতেন। কিন্তু ওইদিন তার চাকরিতে যাওয়া হলো না। ভাষার টানে তিনিও গেলেন মিছিলে। এক সময় পুলিশের গুলি এসে লাগল তাঁর শরীরে। তিনি আহত হলেন। হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হলো। সেখানে দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে তাঁর চিকিৎসা চলল। কিন্তু তাঁকেও বাঁচানো গেল না। এভাবেই শহিদেরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন।

এই ভাষাশহিদেরা দেশকে ভালোবাসতেন। মাতৃভাষাকে ভালোবাসতেন। তাঁরা জীবন দিয়ে বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। আমরা স্বাধীনভাবে বাংলায় কথা বলতে পারছি। তাঁদের ত্যাগের কথা তাই ভুলে যাওয়ার নয়।

তাঁরা অমর। আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি, স্মরণ করি। আমরা তাঁদের কখনো ভুলব না। তাঁদের মতো দেশকে ভালোবাসব। মাতৃভাষাকে ভালোবাসব।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

বসন্তকাল	– বাংলাদেশের একটি ঋতু।	বসন্তকালে দক্ষিণ দিক দিয়ে বাতাস বয়।
থমথমে	– বিপদের ভয়ে নীরব অবস্থা।	আকাশে থমথমে ভাব, ঝড় উঠতে পারে।
মিছিল	– শোভাযাত্রা।	একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে খালি পায়ে যেতে হয়।
টগবগে	– গরম হয়ে ওঠা, রাগে উত্তেজিত হয়ে ওঠা।	তরুণদের মধ্যে সব সময় টগবগে ভাব।
বেপরোয়া	– ভয়হীন। কোনো বাধা নিষেধ মানে না এমন।	সবকিছুতে তার বেপরোয়া ভাব।
হাসপাতাল	– চিকিৎসালয়।	অসুস্থ মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়।
ব্যবসায়	– কারবার। বাণিজ্য।	লোকটি ব্যবসায় উন্নতি করছে।
কৃষিকাজ	– চাষের কাজ, চাষাবাদ।	কৃষকেরা কৃষিকাজ করে।
অসুস্থ	– সুস্থ নয়। রুগ্‌ণ। পীড়িত।	অসুস্থ হলে চিকিৎসা প্রয়োজন।
মাতৃভাষা	– মায়ের মুখ থেকে শিশু যে ভাষা শেখে।	বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।
আত্মত্যাগ	– নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা।	মুক্তিযোদ্ধরা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন।
অমর	– যার মৃত্যু নেই। চিরদিনের জন্য স্মরণীয়।	দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দেন তাঁরা অমর।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

ফাল্গুন	–	ল্গ	=	ল + গ	বল্গা
রক্ত	–	ক্ত	=	ক + ত	শক্ত, ভক্ত
অসুস্থ	–	স্থ	=	স + থ	মুখস্থ, দুস্থ
সম্মান	–	ম্ম	=	ম + ম	আত্মা
শ্রদ্ধা	–	দ্ধ	=	দ + ধ	শুদ্ধ, বুদ্ধ
স্মরণ	–	স্ম	=	স + ম	স্মারক, স্মৃতি
রাষ্ট্রভাষা	–	ষ্ট্র	=	ষ + ট +র–ফলা (্র)	উষ্ট্র, লোষ্ট্র

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে লিখি।

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন –

১) রফিক ২) সালাম
৩) বরকত ৪) জব্বার

(খ) রফিকের বাবা কী করতেন ?

১) ব্যবসায় ২) কৃষিকাজ
৩) চাকরি ৪) শিক্ষকতা

(গ) আবদুস সালামের বাড়ি কোন জেলায় ?

১) মানিকগঞ্জ ২) ঢাকা
৩) ময়মনসিংহ ৪) নোয়াখালি

৪. ডান দিক থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

(ক) বাগানে গাঁদা ও ———— ফুটে আছে।
(খ) পুলিশ ———— করতে নিষেধ করেছে।
(গ) টগবগে তরুণরা ———— ।
(ঘ) এই ভাষাশহিদেরা ———— ভালোবাসতেন।

দেশকে
ডালিয়া
বেপরোয়া
মিছিল
ব্যবসায়

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই।

জীবন	–	মরণ
নতুন	–	পুরনো
গরিব	–	ধনী
সম্ভব	–	অসম্ভব
দিন	–	রাত
পিতা	–	পুত্র

৬. কয়েকটি স্থানের নাম ও পরিচয় জেনে নিই।

ঢাকা	–	রাজধানী ও বড় শহর
ময়মনসিংহ	–	জেলা ও শহর
মানিকগঞ্জ	–	জেলা ও শহর
নোয়াখালি	–	জেলা ও শহর

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

(ক) ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি গাছে কী কী ফুল ফুটেছিল ?
(খ) ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি কে কে শহিদ হয়েছিলেন ?
(গ) ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আমরা কী নামে ডাকি ?
(ঘ) রফিকউদ্দিন আহমদ কেন ঢাকায় এসেছিলেন?
(ঙ) আবদুল জব্বারের বাড়ি কোথায় ?
(চ) পাকিস্তানিরা কী চেয়েছিল?
(ছ) ভাষাশহিদেরা কিসের জন্য জীবন দিয়েছিলেন ?
(জ) ভাষাশহিদেরা কেন অমর ?
(ঝ) ছাত্ররা কী দাবি জানিয়েছিল ?

৮. নিচের শব্দগুলো দিয়ে ছোট ছোট বাক্য তৈরি করি।

পাতা – বসন্তকালে গাছে নতুন পাতা গজায়।
ভাষা –
ডাক্তার –
গুলি –
ত্যাগ –

৯. নির্দিষ্ট নাম বোঝানো শব্দ জেনে নিই।

মাসের নাম – ফেব্রুয়ারি, ফাল্গুন
ফুলের নাম – পলাশ, গাঁদা
জায়গার নাম – ঢাকা, ময়মনসিংহ

এ রকম আরও দুটি করে নাম লিখি।

চল্ চল্ চল্

কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

আমার বাংলা বই

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

ঊর্ধ্ব	– ওপরের দিক।	ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি, পাখি উড়ছে।
গগন	– আকাশ।	গগনে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।
মাদল	– ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র।	সাঁওতালরা নাচের সময় মাদল বাজায়।
নিম্নে	– নিচে।	শব্দটির নিম্নে রেখা টানা হয়েছে।
উতলা	– ব্যাকুল। অস্থির।	মা সন্তানের জন্য উতলা হয়েছেন।
ধরণী	– পৃথিবী।	ধরণী খুবই সুন্দর।
অরুণ	– সকালের সূর্য।	অরুণ আলোয় মন ভরে যায়।
প্রাতে	– সকালে।	প্রাতে ঠান্ডা বাতাস বয়।
উষা	– ভোরবেলা।	আমরা উষাকালে বাগানে হাঁটি।
প্রভাত	– সকাল।	তিনি প্রভাতে বই পড়েন।
টুটাব	– ভাঙব। দূর করব।	আমরা সব বাধা টুটাব।
তিমির	– অন্ধকার।	তিমির রাত ঘনিয়ে আসছে।
বিন্ধ্যাচল	– বিন্ধ্য পর্বত।	বিন্ধ্যাচল একটি পর্বতের নাম।
নবীন	– নতুন।	আমরা নবীনদের বরণ করি।
সজীব	– সতেজ। জীবন্ত।	তরুণটি সব সময় সজীব।
শ্মশান	– মৃতদেহ পোড়ানোর স্থান।	মৃতদেহ শ্মশানে নেওয়া হয়েছে।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

উর্ধ্ব	–	র্ধ্ব	=	রেফ (´) + ধ + ব	
নিম্নে	–	ম্ন	=	ম + ন	
বিন্ধ্যাচল	–	ন্ধ্য	=	ন + ধ + য ফলা (্য)	অন্ধ, বন্ধ
মহাশ্মশান	–	শ্ম	=	শ + ম–ফলা (্ম)	রশ্মি

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) মাদল বাজে কোথায় ?

১) উর্ধ্ব গগনে　　২) ধরণীতলে

৩) উষার দুয়ারে　　৪) মহাশ্মশানে

(খ) অরুণ প্রাতের দলে কারা আছে ?

১) শিশুরা　　২) কিশোরেরা

৩) তরুণেরা　　৪) প্রবীণেরা

৪. কথাগুলো বুঝে নিই এবং লিখি।

(ক) আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

তরুণেরা সজীব প্রাণের অধিকারী। তারা সব সময় অন্ধকার দূর করতে চায়। তারা এজন্য সব বাধা ডিঙিয়ে যাবে।

(খ) নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান

মহাশ্মশানে প্রাণের আনন্দ নেই। কিন্তু তরুণেরা নতুনের গান গেয়ে মহাশ্মশানকেও সজীব করে তুলবে।

৫. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) সারি বেঁধে কারা চলেছে ?
(খ) কারা তিমির দূর করবে ?
(গ) বিন্ধ্যাচল কী ?

৬. আগের চরণটি বলি।

(ক) _____
নিম্নে উতলা ধরণীতল
(খ) _____
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
(গ) _____
সজীব করিব মহাশ্মশান

৭. একই অর্থের শব্দ জেনে নিই।

গগন – আকাশ, আসমান, নভ।
ধরণী – পৃথিবী, অবনী, জগৎ।

৮. তালে তালে পা ফেলে আমরা কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৯. কবিতাটি লিখি।

১০. সবাই মিলে কবিতাটি সুর করে গাই।

স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে

আজ বৃহস্পতিবার। এই দিন শেষের দুই পিরিয়ডে অন্য রকমের কাজ হয় । আনন্দে ভরে ওঠে ছাত্রছাত্রীদের মন। এই দুই পিরিয়ডে কোনো দিন গান শেখানো হয়। কোনো দিন শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করে সাজানো হয়। কখনো শ্রেণিকক্ষের সামনের বাগানের যত্ন নেওয়া হয়। সবাই মিলেমিশে কাজ করে। হাসি আনন্দে ভরে থাকে সময়টা। তাই সবাই বৃহস্পতিবারের অপেক্ষায় থাকে।

আজ ছবি আঁকার আপামণি রূপা আপা তাড়াতাড়ি চলে এলেন।

রূপা : তোমরা তো জানোই আগামী রবিবার আমাদের স্বাধীনতা দিবস। হাতে সময় কম। তাই তোমাদের আজই শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে ফেলতে হবে।

তিথি : হ্যাঁ, করব আপামণি।

রূপা : আজ দুজন দলনেতা থাকবে। রুনু ও আনিস এখানে চলে এসো।

রুনু ও আনিস তাঁর টেবিলের কাছে চলে গেল।

রূপা আপামণির হাতে একটি ডালা। তাতে কত রকমের জিনিস। আর্টবোর্ড, রঙিন কাগজ, কাঁচি, আঠা, রাংতা, রংপেনসিল। আরও অনেক কিছু।

রূপা : এগুলো নাও। পাঁচ মিনিট দুজনে পরামর্শ করো। কী কী তৈরি করবে, কোথায় কোথায় সেগুলো লাগাবে। আমি তো আছিই। প্রয়োজনে আমাকে জিজ্ঞেস করো।

রুনু ও আনিস একটু কথা বলল নিজেদের মধ্যে। তারপর দুটো দলে ভাগ করে দিল সবাইকে। দুটি দল দু দিকে বসে কাজ শুরু করে দিল। একটু গল্প, হাসিও চলতে লাগল।

দু দল মিলে নানা রকমের কাজ করল। লম্বা লম্বা শিকল বানালো রঙিন কাগজ দিয়ে। আর্টবোর্ডে ফুল পাতা এঁকে রং করে নিল। তাতে রাংতার ফিতে দিয়ে কারুকাজ করল। রূপা আপামণি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। তারপর গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। একটু পরে রুনু ও আনিস এলো তাঁর কাছে।

আনিস : আপামণি, আমাদের একটা অনুরোধ আছে।

রূপা : হ্যাঁ, বলো।

রুনু : আমরা একটা দৃশ্য তৈরি করেছি। সেটা পেছনের দেওয়ালে লাগাতে হবে। আমরা দেয়ালটা ব্যবহার করতে চাই।

রূপা : তা করতে পারো।

আনিস : আপনি দয়া করে একটু উঠে দাঁড়ান। আমরা আপনার চেয়ারটা এ দিকে এনে দিচ্ছি। তা হলে আমরা দেয়ালে কাজ করতে পারব।

রূপা : ঠিক আছে।

রূপা উঠে সরে এলেন। আনিস রুনুকে নিয়ে আপামণির চেয়ারটা সরিয়ে আনল।

রুনু : আপামণি, এখন এখানে বসুন।

ওরা প্রথমে সাদা আর্টবোর্ড আঠা দিয়ে দেয়ালে লাগাল। রং করা লম্বা গাছটি সেঁটে দিল বাঁ দিকে। গাছের নিচে সবুজ ঝোপে লাল হলুদ কাগজের ফুল লাগাল। চার পাঁচটি গামছাবাঁধা মাথা দেখা যাচ্ছে সেখানে। হাতে ধরা শক্ত আর্টবোর্ড দিয়ে বানানো রাইফেল। দেয়ালের ডান দিকে বালির বস্তা আঁকা কাগজ লাগাল। সেখানে পাকিস্তানি সেনাদের ছবি। পুরো দৃশ্যটায় যেন একটি যুদ্ধ লেগে গেছে।

নীলার হাতে শক্ত কাগজে বানানো জাতীয় পতাকা। সে মাঝখানে সেটা লাগানোর চেষ্টা করছে। তা দেখে রবি বলল : নীলা, পতাকাটা ওখানে লাগিও না।

নীলা : তাহলে কোথায় লাগাবো ?

রবি : গাছের মগডালে লাগাও।

নীলা : ওখানে তো নাগাল পাচ্ছি না রবি। আমাকে একটু তুলে ধরো না ভাই।

আমার বাংলা বই

রূপা : দাও, আমি ওটা লাগিয়ে দিচ্ছি। রবি, তোমার প্রস্তাবটি খুব ভালো । জাতীয় পতাকার স্থান তো সবার ওপরেই।

রবি : (হেসে) ধন্যবাদ, আপামণি।

রঙিন কাগজের শিকল, ফুল আর পাতা বানানো ছিল। শ্রেণিকক্ষের চারদিকে মালার মতো সেগুলো ঝুলিয়ে দিল রবি ও পারুল। ওদের সাহায্য করল রেবা, শেলি, সালমা ও শাহীন। শিকলের মাঝে মাঝে ফুলপাতার নকশা লাগাল। নীল সাদা রাংতার ফিতে মালার মাঝে মাঝে ঝুলিয়ে দিল। চারদিকটা তখন ঝলমল করে উঠল।

রূপা : খুব সুন্দর কাজ হয়েছে তোমাদের। স্বাধীনতা দিবসে তোমাদের কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

খুশিতে সকলে এক সঙ্গে হাততালি দিল।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

স্বাধীনতা	– বাধাহীনতা, মুক্তি।	২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।
পিরিয়ড	– বেঁধে দেওয়া সময়।	শেষ দুই পিরিয়ডে আজ গান শিখব।
পরিষ্কার	– সাফ।	শুক্রবারে কাপড় পরিষ্কার করতে হবে।
অপেক্ষা	– প্রতীক্ষা। সবুর।	গরমের ছুটির অপেক্ষা করছি।
যত্ন	– সেবা। আদর।	গোলাপ গাছের যত্ন নাও।
আর্টবোর্ড	– ছবি আঁকার শক্ত কাগজ।	রাকিব আর্টবোর্ডে প্রজাপতি এঁকেছে।
রাংতা	– ধাতুর খুব পাতলা পাত।	বিয়েবাড়ি সাজাতে রাংতা কাজে লাগে।
কারুকাজ	– সুন্দর কাজ। শিল্প।	শাড়িতে মা সুতার কারুকাজ করেছেন।
সাঁটা	– লাগানো। যুক্ত করা।	দেয়ালে ছবি সাঁটা আছে।
রাইফেল	– বন্দুক। এক ধরনের হাতিয়ার।	মুক্তিসেনাদের হাতে ছিল রাইফেল।
যুদ্ধ	– লড়াই।	আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভ করেছি।
মগডাল	– গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল।	কোকিলটি মগডালে বসে ডাকছে।
নাগাল	– ছোঁয়া। সংযোগ।	অনেক উঁচুতে থাকা জিনিসের নাগাল পাওয়া কঠিন।
প্রস্তাব	– কথা। আলোচনার বিষয়।	একসঙ্গে খেলার প্রস্তাব সবাই মেনে নিল।
পুরস্কার	– বখশিশ।	ছবি এঁকে শাকিল পুরস্কার পেয়েছে।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। শব্দগুলো পড়ি।

বৃহস্পতিবার	–	স্প		স + প	স্পষ্ট, স্পর্শ
যত্ন	–	ত্ন	=	ত + ন	রত্ন, পত্নী
পরিষ্কার	–	ষ্ক	=	ষ + ক	আবিষ্কার, দুষ্কর
আর্টবোর্ড	–	র্ট	=	রেফ (র্) + ট	শার্ট, চার্ট
		র্ড	=	রেফ (র্) + ড	কার্ড, থার্ড

পরামর্শ	–	র্শ	=	রেফ (র্) + শ	বর্শা, দর্শক
পুরস্কার	–	স্ক	=	স + ক	তিরস্কার, ভাস্কর

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) দুজন দলনেতা কে কে ?

১) তিথি ও রুনু ২) রুনু ও আনিস
৩) রবি ও রুনু ৪) আনিস ও রবি

(খ) শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য ডালায় কোন সারির জিনিসগুলো ছিল ?

১) আর্টবোর্ড, কাঁচি, গামছা, কাগজের ফুল
২) কাঁচি, রঙিন কাগজ, আঠা, রাংতা
৩) ফুল, বোর্ড, রংপেনসিল, রঙিন ফিতে
৪) রাংতা, সবুজ পাতা, কাঁচি, শিকল

(গ) আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে ?

১) ২১শে ফেব্রুয়ারি ২) ২৫শে মার্চ
৩) ২৬শে মার্চ ৪) ১৬ই ডিসেম্বর

(ঘ) ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের ছবিটি তৈরি করল কেন ?

১) স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল বলে
২) নিজেরা মুক্তিযোদ্ধা সাজতে চেয়েছিল বলে
৩) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে বলে
৪) সবাই মিলে আনন্দ করবে বলে

৪. বাম দিকের বাক্য খেয়াল করি। বাক্য দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে ডান দিকের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝি ও বলি।

(ক) তোমাদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখা উচিত।	আদেশ/ উপদেশ
(খ) রুনু ও আনিস, এদিকে এসো।	আদেশ/ অনুরোধ
(গ) আপামণি, আপনি এখন চেয়ারটায় বসুন।	সম্মানসূচক সম্বোধন/ আদেশ
(ঘ) আমাকে একটু তুলে ধরো না ভাই।	অনুরোধ/ আদেশ

(ঙ) কোথায় লাগাব পতাকাটা ?
(চ) খুব সুন্দর কাজ হয়েছে তোমাদের।
(ছ) ধন্যবাদ, আপামণি।
(জ) আপামণি, ছবিটা কি বোর্ডে লাগাতে পারি ?

প্রশ্ন/ অনুরোধ
উপদেশ/ প্রশংসা
ভদ্রতামূলক উত্তর/ অনুরোধ
অনুমতি চাওয়া/ প্রশ্ন করা

৫. বাম পাশের দুটি শব্দ জোড়া দিয়ে একটি শব্দ তৈরি করি।

ছাত্র	+	ছাত্রী	=	ছাত্রছাত্রী
আপা	+	মণি	=	আপামণি
দল	+	নেতা	=	দলনেতা
আর্ট	+	বোর্ড	=	আর্টবোর্ড
ফুল	+	পাতা	=	ফুলপাতা

এ রকম আরও শব্দ চিনে নিই।

শ্রেণিকক্ষ, চকবোর্ড, মগডাল, হাততালি।

৬. নিচের সংলাপগুলো পড়ি। কয়েকটি দলে অভিনয় করে দেখাই।

শিমুল : বাবলু, ব্যাগ গোছানো শুরু করলে যে। চলে যাবে ?
বাবলু : হ্যাঁ রে, ভাই।
শিমুল : এখনও তো বেলা অনেক বাকি। চলো না আরেকটু খেলা করি।
বাবলু : আজ তা হবে না। বাড়ি যেতে হবে এখনই।
শিমুল : কেন ? শীলা, তিথি সবাই তো রয়েছে।
বাবলু : মা দাদিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন। আমার ছোট বোন টুনির সঙ্গে আমাকে বাসায় থাকতে হবে। মা আমাকে চারটার মধ্যে ঘরে ফিরতে বলে দিয়েছেন।
শিলা : শিমুল, ওকে জোর করো না। বাবলু, তুমি এক্ষুনি চলে যাও ভাই। অন্য দিন বেশি সময় খেলা যাবে। তবে সাবধানে যেও।
বাবলু : ধন্যবাদ। আসি। কাল দেখা হবে।
সকলে : হ্যাঁ, এসো।

সংলাপগুলো পড়ে কী বুঝলাম তা ভাবি। সহপাঠীরা একে অন্যকে বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করি ও উত্তর দিই। যেমন :

১) বাবলু ব্যাগ গোছানো শুরু করল কেন ?
২) শিমুল বাবলুকে কী করার জন্য অনুরোধ করল ?
৩) ----------
৪) ----------
৫) ----------
৬) ----------

বাবলু কেমন ছেলে সে সম্পর্কে একটি করে বাক্য লিখি ও পড়ে শোনাই। যেমন –

১) বাবলু গুরুজনের কথা মেনে চলে।
২) ----------
৩) ----------

৬. বাক্যগুলো পড়ি। বৈশিষ্ট্য বোঝানো শব্দ জেনে নিই।

এটা কাগজ। এটা রঙিন কাগজ।

ওটা শিকল। ওটা লম্বা শিকল।

আর্টবোর্ড আনো। সাদা আর্টবোর্ড আনো।

গাছের নিচে ঝোপ। গাছের নিচে সবুজ ঝোপ।

এসব বাক্যে রঙিন, লম্বা, সাদা, সবুজ হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বোঝানো শব্দ। এবার নিচের বাক্যগুলো থেকে বৈশিষ্ট্য বোঝানো শব্দ খুঁজে বের করি ও লিখি।

রুনু সাদা কাগজে একটা চমৎকার দৃশ্য আঁকল। সে তাতে সবুজ গাছ, হলুদ ফুল, নীল আকাশ আঁকল।

৭. শ্রেণিকক্ষ সাজানোর বিষয়টি নিজের ভাষায় বলি।

কুঁজো বুড়ির গল্প

এক ছিল কুঁজো বুড়ি। বুড়ির ছিল তিনটি কুকুর। রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতো। বুড়ি ঠিক করল নাতনির বাড়ি যাবে। তাই রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতোকে ডাকল। বলল, তোরা বাড়ি পাহারা দে। আমি নাতনিকে দেখে আসি।

কুকুর তিনটা বলল, আচ্ছা।

বুড়ি রওয়ানা হলো। লাঠি ঠুক ঠুক করে কুঁজো বুড়ি চলল। খানিক দূরে যেতেই এক শেয়ালের সঙ্গে বুড়ির দেখা। শেয়াল বলল, আমার খুব খিদে। বুড়ি, তোমাকে আমি খাব। বুড়ি বুদ্ধি করে বলল, আমাকে এখন খেয়ো না। আমার গায়ে কি মাংস আছে ? আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়েদেয়ে মোটা তাজা হয়ে আসি। তখন বরং খেয়ো। শেয়াল বলল, ঠিক আছে। তবে তাই যাও, মোটা তাজা হয়ে এসো।

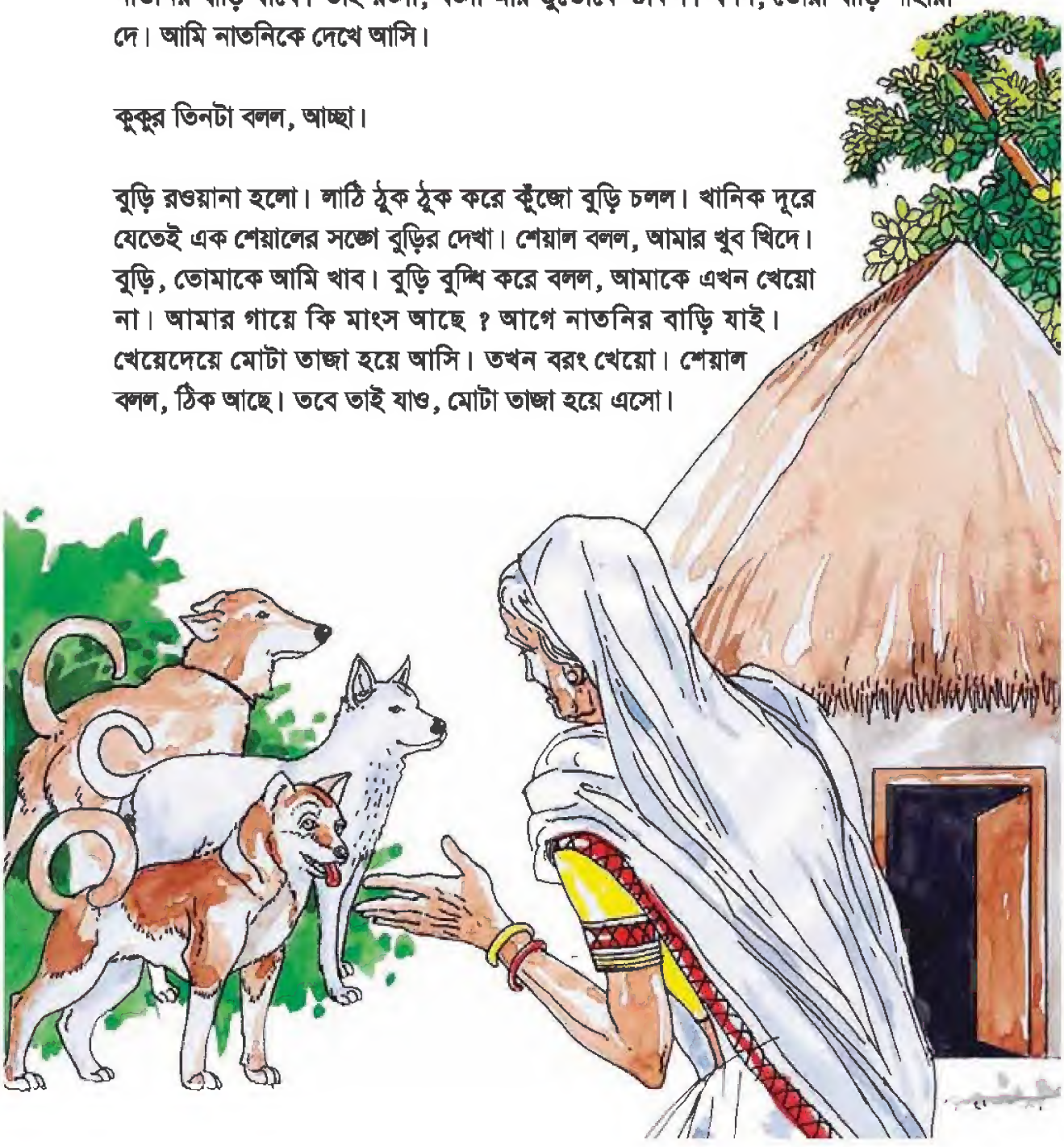

বুড়ি সামনে এগিয়ে চলে। সে লাঠি ঠুক ঠুক করে যায় আর যায়। হঠাৎ এক বাঘ সামনে এসে বলল, হালুম! বুড়ি, তোমাকে আমি খাব। আমার খুব খিদে। বুড়ি দেখে, এ তো মহা মুশকিল। বাঘকেও একই কথা বলে সে। বাঘ বুঝে দেখল, বুড়ির কথা মিছে নয়। সত্যিই বুড়ি বেজায় শুকনো। তখন বলল, বেশ। তবে তাই যাও, কিন্তু ফিরে আসতে হবে, হ্যাঁ।

কুঁজো বুড়ি ফের পথ চলে। আস্তে আস্তে যায় আর যায়। লাঠিতে ভর দিয়ে। এক সময় নাতনির বাড়ি পৌঁছে গেল বুড়ি। নাতনি বুড়িকে বেশ আদর যত্ন করল। নাতনির বাড়িতে কদিন মজার মজার খাবার খেল। তাতে বুড়ি এমন মোটা হলো যে বলার মতো নয়। বুড়ি মহাচিন্তায় পড়ল। এবার ফিরবে কীভাবে ? একে তো এত মোটা যে হাঁটতে পারে না। তারপর আরও চিন্তা পথের। শেয়াল আর বাঘের ভয়। বুড়ি নাতনিকে সব কথা খুলে বলল। নাতনি বলল, চিন্তার কিছু নেই। একটুও ভেবো না তুমি। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

নাতনি একটা মস্ত বড় লাউয়ের খোল যোগাড় করল। তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল বুড়িকে। সঙ্গে দিল কিছু চিড়ে আর গুড়। এবার খোলটাকে দিল জোরে এক ধাক্কা। গড়িয়ে চলল সেই লাউয়ের খোল। ভেতরে বুড়ি। খোল তো গড়াতে গড়াতে চলে এলো বাঘের কাছে। বাঘ মনে করল এটা আবার কী ? বুড়ি কি তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল ? বাঘ গর গর করে খোলে দিল এক ধাক্কা। আবার গড়িয়ে চলল লাউয়ের খোল। বুড়ি ছড়া কাটে –

লাউ গুড় গুড় লাউ গুড় গুড়
চিড়ে খায় আর খায় গুড়
বুড়ি গেল অনেক দূর।

খোল গড়াতে গড়াতে শেয়ালের কাছে এলো। শেয়াল ভাবল, এটা আবার কী ? শেয়াল শুনতে পেল খোলের ভেতর যেন কিসের আওয়াজ। সে ভাবল, দেখি ভেতরে কী আছে ? এই ভেবে খোলটি ফেলল ভেঙে। শেয়াল দেখল খোলের ভেতরে বুড়ি। বলল – বুড়ি এবার তোমাকে এক্ষুনি খাব। বুড়ি বলল, খাবি তো খুব ভালো কথা। কিন্তু আমারও তো কিছু ইচ্ছে আছে। সখ আছে। আমি যে তোর একটা গান শুনতে চাই। শেয়াল হেসে বলল। ও এই কথা। শেয়াল তক্ষুনি গান ধরল, হুক্কা হুয়া। হুক্কা হুয়া। বুড়ি গিয়ে দাঁড়াল একটা উঁচু ঢিবির ওপর। বুড়ি দিল চিৎকার গানের সুরে।

আয় আয় তু তু
রঙ্গা বঙ্গা ভুতু
আয় আয় আয়
জলদি চলে আয়

নিমেষেই ছুটে এলো বুড়ির কুকুর তিনটা। রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতো। শেয়ালকে ঘিরে ফেলল তারা। একটা কুকুর কামড় দিল শেয়ালের কানে, একটা পায়ে, আরেকটা ঘাড়ে। বাছা এবার যাবে কোথায় ? শেয়াল তখন নাস্তানাবুদ, কুপোকাৎ। মরমর দশা।

কুঁজো বুড়ি মহানন্দে চলল তার বাড়ির দিকে। সঙ্গে রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতো।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলো জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

কুঁজো	– যার পিঠ বাঁকা ও ফোলা।	কুঁজো লোকটির মাথায় বোঝা।
খিদে	– ক্ষুধা।	ফুলির খুব খিদে পেয়েছে।
মুশকিল	– অসুবিধা।	কাজটা করতে গেলে মুশকিল হবে।
বেজায়	– বেশি।	খবরটা শুনে সে বেজায় খুশি।
যত্ন	– সাবধানতা। গোছগাছ।	আমি বইখাতা যত্ন করে রাখি।
আওয়াজ	– শব্দ।	দূর থেকে গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম।
এক্ষুনি	– এখনি। একটুও দেরিতে নয়।	আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।
তক্ষুনি	– তখনই।	তক্ষুনি কাজটা করে ফেললে ভালো হতো।
সখ	– ইচ্ছা।	আমার সখ ঘুড়ি উড়ানো।
নাস্তানাবুদ	– নাজেহাল।	কুকুরগুলো শেয়ালটাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল।
কুপোকাৎ	– পতন। পরাজিত।	সে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে কুপোকাৎ হলো।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

আচ্ছা	–	চ্ছ	=	চ + ছ	খাচ্ছে, ইচ্ছা
ধাক্কা	–	ক্ক	=	ক + ক	ছক্কা, এক্কা

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) কুঁজো বুড়ি বাড়ি পাহারা দিতে কাদের বলল ?

১) দারোয়ানদের ২) পাহারাদারদের

৩) কুকুর তিনটিকে ৪) নাতিনাতনিকে

(খ) বিপদ দেখে বুড়ি শেয়ালকে বলেছিল– "আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়ে দেয়ে মোটা তাজা হয়ে আসি।" এ কথায় বুড়ির কিসের পরিচয় পাওয়া যায় ?

১) বুদ্ধির ২) বোকামির

৩) রসিকতার ৪) রাগের

(গ) নিমেষেই ছুটে এলো বুড়ির কুকুর তিনটা। কেন ?

১) শেয়ালের ডাক শুনে।

২) গানের সুরে বুড়ির চিৎকার শুনে।

৩) শেয়ালের গান শুনে

৪) মুরগির খোঁজ পেয়ে ।

(ঘ) নাতনি বুড়িকে লাউয়ের খোলে ঢুকিয়ে সঙ্গে কী কী খাবার দিল ?

১) চিড়ে আর দই ২) চিড়ে আর গুড়

৩) গুড় আর মুড়ি ৪) গুড় আর খই

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) বুড়ির কয়টি কুকুর ছিল ? তাদের নাম কী কী ?

(খ) বুড়ি কোথায় যাচ্ছিল ?

(গ) কুকুর তিনটাকে সে কী বলে গেল ?

(ঘ) বুড়ি শেয়ালকে কী বলল ?

(ঙ) বুড়ি বাঘকে কী বলল ?

(চ) নাতনির বাড়িতে গিয়ে বুড়ি এত মোটা হলো কীভাবে ?

(ছ) নাতনি বুড়িকে কী রকম করে পাঠাল ?

(জ) বাড়ি ফেরার পথে কার কার সঙ্গে বুড়ির দেখা হলো ?

(ঝ) শেয়াল খোলটি ভেঙে ফেলল কেন ?

(ঞ) বুড়ি কীভাবে বাঁচল ?

৫. বাক্যগুলো পড়ি। প্রশ্ন বোঝানো বাক্য জেনে নিই।

আমার গায়ে কি মাংস আছে ?

সে ফিরবে কীভাবে ?

এটা আবার কী ?

ভেতরে কী আছে ?

এবার যাবে কোথায় ?

এসব বাক্যে কিছু জানার ভাব বা জানার ইচ্ছে বোঝাচ্ছে। এগুলোকে বলে প্রশ্নবাক্য। এ ধরনের বাক্যের শেষে প্রশ্নচিহ্ন (?) বসে।

৬. কুঁজো বুড়ির গল্পটা মুখে মুখে বলি।

৭. নিচের অংশটুকু পড়ি ও অভিনয় করি। [শিক্ষক সহায়তা করবেন]

[লাউয়ের খোল থেকে বুড়ি বেরিয়ে এসেছে। শেয়াল বুড়িকে খাবেই]

শেয়াল ॥ বুড়ি এবার তোমাকে ছাড়ব না। তোমাকে খাবই।

বুড়ি ॥ তা তো খাবিই। সে রকমই তো কথা ছিল। তাছাড়া আমি তো মোটা তাজা হয়ে এসেছি।

শেয়াল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, চটপট করে তৈরি হয়ে নাও।

বুড়ি ॥ (আকাশে চাঁদ দেখিয়ে) দেখ, দেখ, চাঁদের আলো কেমন ঝিকমিক করছে। একটা গান শুনবি ?

শেয়াল ॥ বেশ তো গান করো। কিন্তু তোমাকে আমি ঠিকই খাব। আজকে আর ছাড়ছি না।

বুড়ি ॥ (গান ধরল)

আয় আয় তু তু
রঙ্গা বঙ্গা ভু তু
আয় আয় আয়
জলদি চলে আয়।

শেয়াল ॥ (দেখল রঙ্গা, বঙ্গা ও ভুতো বুড়ির কুকুর তিনটা জোরে ছুটে আসছে।) বাবা গো, মা গো, এবার বুঝি প্রাণটা গেল।

রঙ্গা, বঙ্গা ও ভুতো ॥ (শেয়ালকে লক্ষ করে) দাঁড়াও, এবার তোমাকে মজাটা দেখাচ্ছি !

তালগাছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়
কোথা পাবে পাখা সে।

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার
মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।
সারাদিন ঝরঝর থথর
কাঁপে পাতা পত্তর
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়
পাতা কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি
যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

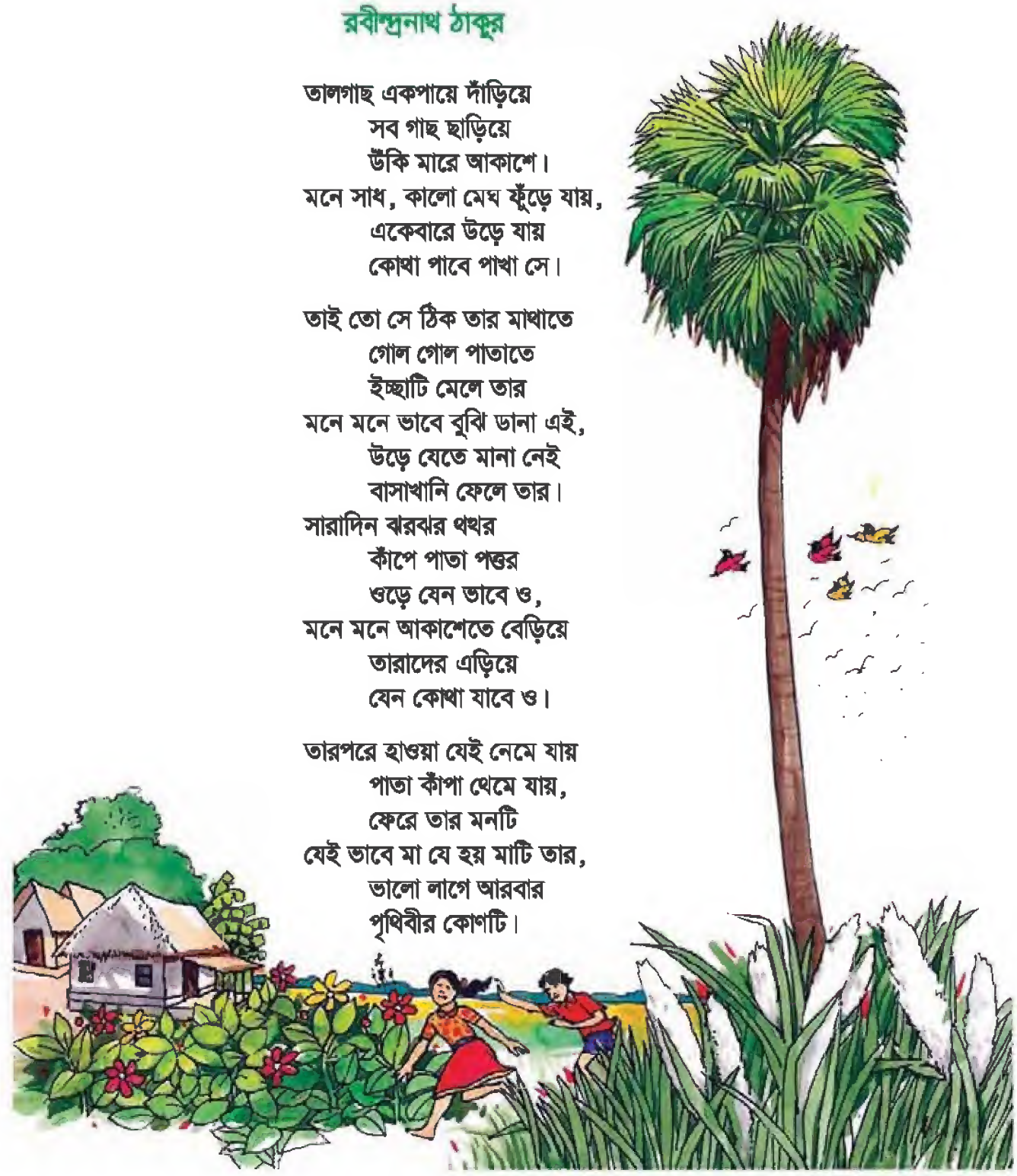

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

সাধ – ইচ্ছা। দীপুর পাখির মতো ওড়ার সাধ হয়েছে।
থথর – থর থর। শীলা শীতে থথর করে কাঁপছে।

২. কথাগুলো বুঝে নিই।

পত্তর – পাতা।
ফেরে – ফিরে আসে।
ফেরে তার মনটি – তার ইচ্ছে বদলে যায়।
আরবার – আরেক বার।

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) তালগাছ মনে মনে কাকে মা বলে ভাবে ?

১) মেঘকে ২) আকাশকে
৩) মাটিকে ৪) পৃথিবীকে

(খ) তালগাছের মনে কী ইচ্ছে জাগে ?

১) সব গাছের চেয়ে উঁচু হবে ২) পাতায় ভর করে ভাসবে
৩) আকাশে উঁকি মেরে দেখবে ৪) কালো মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাবে

(গ) তালগাছের ইচ্ছে কখন বদলায়?

১) মায়ের কথা মনে হলে ২) দিন শেষ হলে
৩) বাতাস থেমে গেলে ৪) বেড়ানো শেষ হলে

৪. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) তালগাছকে দেখে কী মনে হয় ?
(খ) 'মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়' কথাটির অর্থ কী ?
(গ) তালগাছ কীভাবে তার ইচ্ছেকে ছড়িয়ে দেয়?
(ঘ) তালগাছ পাখা চায় কেন?

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ নিয়ে বাম দিকের কবিতার শূন্য জায়গা পূরণ করি।

(ক) তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ————
(খ) তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়
———— ———— থেমে যায়।
(গ) যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে ————
———— কোণটি

আরবার
কাঁপা
ছাড়িয়ে
পৃথিবীর
পাতা
ঝরঝর

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পৃথিবী, সাধ, মনে মনে, ডানা, মাটি।

৭. 'তালগাছ' কবিতার প্রথম বারো লাইন মুখস্থ লিখি।

৮. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

একাই একটি দুর্গ

এপ্রিল ১৯৭১।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এগিয়ে আসছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। তাদের ঠেকানোর জন্য লড়াই করছে মুক্তিযোদ্ধারা। তারা অবস্থান নিয়েছে দরুইন গ্রামে। দলে মাত্র দশ জন সৈন্য। আর তার অধিনায়ক হচ্ছেন সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল।

৭ই মার্চ ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মোস্তফা কামাল তখন চব্বিশ বছরের সাহসী যুবক। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে তাঁর বুক ফুলে ওঠে। মুক্তির স্বপ্নে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর চোখ।

১৬ই এপ্রিল ১৯৭১। মোস্তফা কামাল পাকিস্তানি বাহিনীর খবর পেলেন। তারা কুমিল্লার আখাউড়া রেললাইন ধরে এগিয়ে আসছে। তারা চাইছে, মুক্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করতে।

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১। ভোর থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করল। মোস্তফা কামাল ভাবতে লাগলেন। এত কম শক্তি নিয়ে ওদের মোকাবেলা করা যাবে না। তিনি খবর পাঠালেন জরুরি সেনা সহায়তার জন্যে।

কিন্তু বাড়তি সেনা এলো না। এমনকি দু দিন ধরে নিয়মিত খাবারের সরবরাহও বন্ধ। চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন মোস্তফা কামাল। সকলে মিলে আত্মরক্ষা করলেন পরিখার মধ্যে।

দুপুরের দিকে বাড়তি কয়েকজন সেনা দরুইনে এসে পৌঁছল। সেই সঙ্গে খাবারও এলো। তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পাকিস্তানি ঘাঁটি থেকে গোলাবর্ষণও হলো বন্ধ।

১৮ই এপ্রিল ১৯৭১। সকাল বেলা সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। ঈশান কোণ থেকে আসতে লাগল বৃষ্টিভেজা শীতল বাতাস। মুক্তিযোদ্ধারা ভাবলেন, বৃষ্টি এলে দুশমনদের হামলা থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে।

সারা সকাল নির্বিঘ্নে কাটল। পাকিস্তানি বাহিনীর তরফ থেকে কোনো রকম গোলাবর্ষণ হলো না। কেবল কয়েকটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল।

সকাল এগারোটা। শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। আর সেই সঙ্গে শত্রুর গোলাবর্ষণ। তারই আড়াল নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল পাকিস্তানি বাহিনী। বেলা বারোটা। আক্রমণ হলো আরও তীব্র। মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা গুলি তার সামনে কিছুই না।

হঠাৎ একটা গুলি এসে বিঁধল এক মুক্তিযোদ্ধার বুকে। তিনি মেশিন গান চালাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল মেশিন গান। মোস্তফা কামাল পাশেই ছিলেন। তিনি মুহূর্ত দেরি না করে চালাতে লাগলেন মেশিন গান।

পাকিস্তানি সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক। সঙ্গে ভারি অস্ত্রশস্ত্র। তারা দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছে। মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় কম। ভারি অস্ত্রশস্ত্র তাদের তেমন নেই। বেশির ভাগই হালকা অস্ত্র। তাদের সামনে কেবল দুটি পথ খোলা। হয় সামনাসামনি যুদ্ধ। না হয় পুব দিক দিয়ে পিছু হটতে হবে। তাহলেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া যাবে।

কিন্তু পিছু হটতে চাইলেও কিছুটা সময় দরকার। ততক্ষণ অবিরাম গুলি চালিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে দুশমনদের। এ দায়িত্ব কে নেবে ?

আরও একজন ঢলে পড়ল শত্রুর গুলিতে। মোস্তফা কামাল পরিখার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চালাতে লাগলেন গুলি। উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে। নয় জন মুক্তিযোদ্ধা এর মধ্যেই নিহত হয়েছেন। কয়েকজন কমবেশি আহত। পিছু না হটলে সবার মৃত্যু অবধারিত।

মোস্তফা কামাল দৃঢ়তার সঙ্গে সবাইকে সরে যেতে বললেন। তিনি একা গুলি চালিয়ে যাবেন। কিন্তু সাথীরা মোস্তফাকে একা ফেলে রেখে যেতে রাজি নন। মোস্তফা জোর দিয়ে বললেন, আপনাদের পিছু হটতেই হবে। তা না হলে দুশমনরা সবাইকে শেষ করে দেবে। তিনি আবার আদেশ দিলেন, সময় নষ্ট করবেন না। সবাই দ্রুত সরে যান।

শেষ পর্যন্ত মোস্তফা কামালকে রেখে বাকিরা খুব সাবধানে পিছু হটলেন।

অনবরত গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন মোস্তফা কামাল। তাঁর গুলির তোড়ে শত্রুরা এগুতে পারছে না। তিনি একাই যেন মুক্তিবাহিনীর একটা দুর্গ। এক সময় গুলি শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ একটা গোলা এসে পড়ল পরিখার মধ্যে। শত্রুর গোলার আঘাতে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু তার বিনিময়ে রক্ষা পেল সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যবান জীবন।

দরুইনের মাটিতে সমাহিত হয়ে আছে মোস্তফা কামালের ক্ষতবিক্ষত দেহ। তাঁর মনোবল ও আত্মদানের কথা দেশবাসী কোনো দিন ভুলবে না।

মোস্তফা কামাল আমাদের গর্ব। তিনি আমাদের গৌরব। তিনি আমাদের অকুতোভয় বীর। এজন্যে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করেন।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

অধিনায়ক	– দলপতি। দলনেতা।	অধিনায়ক লড়াই চালিয়ে যেতে বললেন।
পরিখা	– শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে মাটির মধ্যে তৈরি গর্ত।	সৈন্যরা পরিখার ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়ছে।
স্বস্তি	– চিন্তা থেকে মুক্তি।	বিপদ কেটে যাওয়ায় সবাই স্বস্তি পেল।
ঈশান কোণ	– উত্তর ও পূর্ব দিকের মাঝামাঝি কোণ।	ঈশান কোণে মেঘ জমেছে।
নির্বিঘ্নে	– নিরাপদে। বাধাহীনভাবে।	যাত্রীরা নির্বিঘ্নে নদী পার হলো।
তোড়ে	– প্রবল বেগে।	গুলির তোড়ে শত্রুরা থমকে গেল।
অকুতোভয়	– ভয় নেই এমন।	তিনি একজন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা।
বীরশ্রেষ্ঠ	– মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্যে দেওয়া বিশেষ উপাধি।	মোস্তফা কামাল একজন বীরশ্রেষ্ঠ।
সমাহিত	– কবরে শায়িত।	মোস্তফা কামালকে দরুইনে সমাহিত করা হয়।

২. উপযুক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করি।

(ক) চিন্তায় ———————— হয়ে উঠলেন মোস্তফা কামাল।
(খ) সারা সকাল ———————— কাটল।
(গ) কিন্তু ———————— হটতে চাইলেও কিছুটা সময় দরকার।
(ঘ) শত্রুর গোলার আঘাতে তাঁর শরীর ———————— হয়ে গেল।
(ঙ) তিনি আমাদের অকুতোভয় ———————— ।

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) দরুইন গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে কয়জন সৈন্য ছিল ?

১) আট জন　　২) নয় জন

৩) দশ জন　　৪) এগারো জন

(খ) ১৮ই এপ্রিল কয়টার সময়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো ?

১) সকাল ৯টায়　　২) সকাল ১১টায়

৩) দুপুর ১টায়　　৩) দুপুর ২টায়

৪. বিপরীত শব্দ লিখি।

সাহস – ভয়

নিয়মিত – অনিয়মিত

বাড়ানো –

কম –

বাড়তি –

ভারি –

পূর্ব –

মৃত্যু –

আহত –

৫. পাঠ অনুসরণ করে নিচের ঘটনার পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি।

(ক) পাকিস্তানি বাহিনী আখাউড়া রেললাইন ধরে অগ্রসর হয় – ১৬ই এপ্রিল

(খ) দরুইন গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর গোলাবর্ষণ হয় –

(গ) মোস্তফা কামাল শহিদ হলেন –

৬. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি।

(ক) শহিদ দিবস – ২১শে ফেব্রুয়ারি

(খ) স্বাধীনতা দিবস –

(গ) বিজয় দিবস –

৭. বাক্যগুলো পড়ি। হাঁ বোঝানো এবং না বোঝানো বাক্য সম্পর্কে জেনে নিই।

ওদের মোকাবেলা করা যাবে।	[হাঁ বোঝানো]
ওদের মোকাবেলা করা যাবে না।	[না বোঝানো]
সকালে গোলাবর্ষণ করা হলো।	[হাঁ বোঝানো]
সকালে গোলাবর্ষণ করা হলো না।	[না বোঝানো]
শত্রুরা এগুতে পারছে।	[হাঁ বোঝানো]
শত্রুরা এগুতে পারছে না।	[না বোঝানো]

এবার নিচের বাক্যগুলোকে না বোঝানো বাক্যে পরিবর্তন করি।

আমরা তাকে ভুলব।
মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটবে।
মোস্তফা কামাল যেতে চাইলেন।

৮. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) কারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল ?
(খ) মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় অবস্থান নিয়েছিল ?
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে কোন দুটি পথ খোলা ছিল ?
(ঘ) সঙ্গীদের জীবন বাঁচাতে মোস্তফা কামাল কী সিদ্ধান্ত নিলেন ?
(ঙ) একাই একটি দুর্গ কাকে বোঝানো হয়েছে ? কেন ?

আমার পণ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
একসাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।

সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দিই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া এই বলি মনে মনে।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

গুরুজন	– সম্মানীয় ব্যক্তি।	মা বাবা শিক্ষক আমাদের গুরুজন।
পাঠ	– পড়া।	আমরা পাঠ শেষ করে খেলতে যাই।
হেলা	– অবহেলা।	কাউকে হেলা করব না।
আদেশ	– হুকুম।	বড়দের আদেশ মেনে চলা উচিত।
ফাঁকি	– কাজে অবহেলা।	কাজে ফাঁকি দেওয়া উচিত নয়।
কভু	– কখনো।	কভু মিথ্যা বলব না।
সামলিয়ে	– এড়িয়ে।	লোভ সামলিয়ে যেন চলতে পারি।

২. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) কী সামলিয়ে রাখতে হবে ?

১) মিছা ২) সুখ

৩) লোভ ৪) দুখ

(খ) কবিতাটি থেকে আমরা কী শিখলাম ?

১) সবাই যেন একসঙ্গে সুখে বাস করতে পারি।

২) সবাই মিলেমিশে সৎ জীবন কাটাতে পারি।

৩) সবাই যেন সবাইকে ভালোবাসতে পারি।

৪) সবাই সাবধানে সুখে জীবন কাটাতে পারি।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) সারাদিন আমি কীভাবে চলব ?
(খ) কারা গুরুজন ?
(গ) পড়ার সময় আমরা কী করব ?
(ঘ) কোন ধরনের কথা আমরা কখনো বলব না ?
(ঙ) কাদের আমরা ভালোবাসব ?
(চ) অন্যের দুঃখে আমরা কী করব ?

৪. ডান দিকে প্রতি সারিতে দুটি করে কথা আছে। বাঁ দিকের কথার সঙ্গে ঠিক কথাটি মিলিয়ে লিখি।

আদেশ মেনে চলি	গুরুজনদের / ভালো ছেলেদের
ভালোবাসি	ভালো ছেলেদের / সবাইকে
কাজ করি	মনে মনে / ভালো মনে
পাঠের সময়	করি খেলা / নাহি হেলা
সামলে রাখি	দুঃখ / লোভ

৫. কারা গুরুজন জেনে নিই।

মা, বাবা, দাদা, দাদি, নানা, নানি, চাচা, চাচি, মামা, মামি, ফুফু, ফুফা, খালা, খালু, শিক্ষক।

৬. শব্দগুলো দিয়ে নতুন বাক্য তৈরি করি।

সকাল –

ভালো –

ঝগড়া –

খেলা –

মিলে –

৭. কাজ বোঝানো শব্দ জেনে নিই।

আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি। [ওঠা]
কথাটা মনে মনে বললাম। [বলা]
আমি নিজের কাজ নিজে করি। [করা]
সবাই মিলে মিশে থাকি। [থাকা]

ওঠা, বলা, করা, থাকা – এগুলো কাজ বোঝানো শব্দ। এগুলো দিয়েই বাক্যে উঠি, বললাম, করি, থাকি শব্দ তৈরি হয়েছে।

৮. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

৯. আমার ইচ্ছে সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

পাখপাখালির কথা

বাড়ির আশেপাশে গাছগাছালি থাকলে রোজ সকালে একটা মজার কান্ড ঘটে। নানা রকম পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে। ওরা নানা সুরে ডাকাডাকি করে । তাতে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। এর অনেক পাখিই আমাদের পরিচিত। পাখি আমাদের অনেক উপকার করে। পরিবেশ রক্ষা করে তারা। তারা আমাদের প্রতিবেশীর মতো। তারা আমাদের বন্ধু।

আমাদের খুব পরিচিত পাখি কাক। কালো পালকে ঢাকা শরীর তার। এদের ঠোঁট খুব শক্ত। কাক কা কা করে ডাকে। এরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে। কোনো কাকের বিপদ ঘটলে অন্যরা দলে দলে ছুটে আসে। তারপর উঁচু স্বরে ডাকতে থাকে। যেন প্রতিবাদ জানায়। খুব চালাক বলে নাম আছে কাকের। তবে মজার বোকামির কান্ডও করে সে। না চিনেই কোকিলের ডিমে তা দেয়। বাচ্চা ফুটিয়ে দেয়।

আরেকটি চেনা পাখি কোকিল। এদের রংও কালো। তবে কালোর ওপরে উজ্জ্বল নীল রঙের পোঁচ দেওয়া। ঠোঁট সবুজ ও বাঁকানো। চোখের রং টকটকে লাল। লম্বা লেজ আছে। কোকিল ডাকে উঁচু ও সুরেলা কণ্ঠে। কুউ–উ–উ, কুউ–উ–উ ডাক ঠিক গানের মতো মিষ্টি। কোকিল বসন্তকালে ডাকে। মানুষ মুগ্ধ হয় তার গানে। কোকিল কখনো মাটিতে নামে না। এরা ডিম পাড়ে কাকের বাসায়।

ছোট পাখি বুলবুলি। মিষ্টি গানের কণ্ঠ তার। টুট টুট টিট, চিরুক চিরুক বলে গান গায়। হালকা বাদামি আর কালো রঙের হয় বুলবুলি। লম্বা লেজের গোড়ায় আছে লাল টুকটুকে ছোপ। এরা পোষ মানে সহজে। বুলবুলি লড়াকু পাখি। আগেকার দিনে মেলায় বুলবুলির লড়াই হতো। মাথার ওপরে সামনে ঝুলে পড়া একটি ঝুঁটি আছে তার।

ময়না দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি মিষ্টি তার গান। অন্য পাখির ডাক, মানুষের কথা অবিকল নকল করতে পারে সে। এজন্য মানুষ তাকে শখ করে পোষে, নানা কথা শেখায়। ময়নার রং কালো। চোখের নিচে ও মাথার পেছনদিকে হলুদ চওড়া রেখা টানা। তার ঠোঁট কমলা লালে মেশানো। পা দুটি তার হলুদ।

টিয়া সবুজ রঙের পাখি। ঘাসের মতো সবুজ তার ডানা ও লম্বা লেজ। বাঁকানো ঠোঁট টুকটুকে লাল আর খুব শক্ত। গলায় আছে মালার মতো লাল ও কালো রঙের দাগ। ঝাঁক বেঁধে চলে আর ডাকে টি ট্যাক, কিয়াক কিয়াক, কিক কিক। টিয়াও পোষ মানে। মানুষের শেখানো কথা চমৎকার করে বলতে পারে।

ছোট্ট পাখি দোয়েল। দেশের সব জায়গায় দেখা যায় এদের। ঝোপে ঝাড়ে, গাছের কোটরে, দালানের ফাঁকে ফোকরে থাকে। দোয়েলের মতো মিষ্টি গান গাইতে পারে খুব কম পাখি। নরম সুরে শিস দেয়। সে ডাকে আমাদের মন মাতে। সাদাকালোয় সাজানো তার পালকের পোশাক। ডানার ওপরে চওড়া সাদা দাগ টানা। এর লেজ বেশ লম্বা। এরা ইচ্ছে হলেই লেজ নাচিয়ে খেলা করে। **দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।**

সবচেয়ে ছোট পাখি টুনটুনি। এরা বেশ চঞ্চল। কোথাও স্থির হয়ে বসে না। এরা ছোট ছোট গাছে নেচে নেচে বেড়ায়। টিট টিট, টুইট টুট, টুইটি টুট শব্দে মিষ্টি করে ডাকে। লম্বা লেজ তার ভারি সুন্দর। এরা গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে নিজের বাসা বানায়। তাই টুনটুনিকে বলা হয় দরজি পাখি।

ছোট্ট পাখি বাবুই। এরা খুব সুন্দর করে বাসা বানাতে পারে। সরু সরু আঁশ দিয়ে তারা বাসা বোনে। লম্বাটে বাসাগুলো বাতাসে দোল খায়। তখন খুব সুন্দর দেখায়। সুন্দর বাসা বুনতে পারে বলে বাবুইকে বলা হয় তাঁতি পাখি। একে শিল্পী পাখিও বলা হয়।

আমাদের চেনা পাখি শালিক। চকচকে বাদামি পালকে ঢাকা শরীর। ঠোঁট ও চোখের পাশটা হলুদ রঙের। বাদামি দুই ডানার নিচে দুটি উজ্জ্বল সাদা দাগ টানা। খাটো দুটি পা হলুদ রঙের। এরা দল বেঁধে চলতে ভালোবাসে। গরুর পালের সঙ্গেও এদের দেখা যায়। ওড়ার সময় বাদামি হলুদ আর সাদার ঝলক ওঠে তাদের ডানায়। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মাছরাঙা এ দেশের একটি সুন্দর পাখি। এ পাখির মাথা, ঘাড়, পেট ও পিঠের রং গাঢ় বাদামি। তা খয়েরি রঙেরও হয়। চিবুক, গলা ও বুকেও থাকে নানা রং। ডানার পালক উজ্জ্বল নীল। তার ওপরে চওড়া কালো দাগ টানা। ঠোঁট বেশ লম্বা, ডগার দিকটা সুঁচালো ও শক্ত। ঠোঁট ও পায়ের রং লাল। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে এরা দুই ঠোঁটে মাছ তুলে আনে।

আরও কত যে পাখি আছে আমাদের দেশে। আর কত যে তার নাম। চড়ুই, বক, খঞ্জনা, ঘুঘু, শঙ্খচিল, ডাহুক, শ্যামা। এসব পাখির কথাও আমরা পরে জেনে নেব।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

পাখপাখালি	– ছোট বড় নানা জাতের পাখি।	আমাদের বনে বনে আছে পাখপাখালি।
গাছগাছালি	– নানা ধরনের গাছ ও লতা।	নানাবাড়ির চারপাশে কত গাছগাছালি।
প্রতিবেশী	– পড়শি। কাছাকাছি বসবাস করে যারা।	শীলা চাচি আমাদের প্রতিবেশী।
পালক	– পাখির শরীর বা পাখার আবরণ।	বকের পালক সাদা।
প্রতিবাদ	– আপত্তি, বিরোধিতা।	খারাপ কাজ দেখলে প্রতিবাদ করব।
পোঁচ	– মাখানো, লেপা।	সাঁঝের আকাশে অনেক রঙের পোঁচ।
ছোপ	– দাগ। রং।	পাতাবাহারে সবুজের মধ্যে হলুদ ছোপ আছে।
লড়াকু	– যোদ্ধা। যুদ্ধ করতে দক্ষ।	বাঙালি লড়াকু জাতি।
ঝুঁটি	– খোঁপা। মাথার ওপরে গোছা করে বাঁধা চুল।	গরমে মেয়েরা ঝুঁটি করে চুল বাঁধে।
শখ	– পছন্দ। আগ্রহ।	বন্ধুদের ছবি জমানো রবির শখ।
ঝাঁক	– দল। পাল।	এক ঝাঁক পাখি উড়ছে।
তাঁতি	– (কাপড়) বোনে যে।	তাঁতিরা খুব সুন্দর শাড়ি বোনে।
ঝলক	– ঢেউ। তরঙ্গ।	দুপুরের রোদে যেন আগুনের ঝলক ওঠে।
ঝলমল	– উজ্জ্বল। চকচকে।	বৃষ্টিভেজা পাতায় রোদ লেগে ঝলমল করছে।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

কণ্ঠ	–	ণ্ঠ	=	ণ	+	ঠ		গুণ্ঠন, কুণ্ঠা
উচ্চ	–	চ্চ	=	চ	+	চ		বাচ্চা,গচ্চা
উজ্জ্বল	–	জ্জ্ব	=	জ	+	জ + ব		প্রোজ্জ্বল
লম্বা	–	ম্ব	=	ম	+	ব		খাম্বা, কম্বল
মুগ্ধ	–	গ্ধ	=	গ	+	ধ		দুগ্ধ, দগ্ধ
সৌন্দর্য	–	ন্দ	=	ন	+	দ		ছন্দ, মন্দ
		র্য	=	য	+	রেফ (´)		কার্য, ধার্য
ছোট্ট	–	ট্ট	=	ট	+	ট		ভুট্টা, খোট্টা
উল্টে	–	ল্ট	=	ল	+	ট		পাল্টা, মাল্টা
চঞ্চল	–	ঞ্চ	=	ঞ	+	চ		অঞ্চল, ব্যাঞ্চন
শিল্পী	–	ল্প	=	ল	+	প		গল্প, অল্প
খঞ্জনা	–	ঞ্জ	=	ঞ	+	জ		অঞ্জন, গঞ্জ
শঙ্খচিল	–	ঙ্খ	=	ঙ	+	খ		শৃঙ্খলা, ময়ূরপঙ্খী

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) গান গাইতে পারে কোন পাখি ?

১) বাবুই ২) ময়না
৩) শালিক ৪) টিয়া

(খ) ঝাঁক বেঁধে চলে কোন সারির পাখিরা ?

১) কোকিল, বাবুই, ময়না ২) শালিক, বাবুই, বুলবুলি
৩) কাক, টিয়া, শালিক ৪) মাছরাঙা, টুনটুনি, দোয়েল

(গ) কোন সারির সব শব্দের অর্থ এক ?

১) ঝলক, ঝলমল, উজ্জ্বল ২) ঝাঁক, পাল, দল
৩) পালক, ঝলক, নকল ৪) আগ্রহ, দক্ষ, চালাক

(ঘ) পাখিদের আমরা রক্ষা করব। কারণ –

১) পাখিরা আমাদের পরিচিত ২) পাখিরা আমাদের পড়শি
৩) পাখিরা দল বেঁধে চলে ৪) পাখিরা আমাদের উপকার করে

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) কোন কোন পাখি গান গাইতে পারে ?
(খ) মানুষের কথা নকল করতে পারে কোন কোন পাখি ?
(গ) বুলবুলিকে লড়াকু পাখি বলা হয় কেন ?
(ঘ) কোন কোন পাখিকে ছোট পাখি বলা হয় ?
(ঙ) টুনটুনিকে দরজি পাখি বলা হয় কেন ?
(চ) তাঁতি পাখি কোনটি ? এদের তাঁতি পাখি বলা হয় কেন ?

৫. বাম দিকের পাখির নামের সঙ্গে ডান দিকের পাখির ডাক মিলিয়ে বলি ও লিখি।

(ক) কাক ডাকে	টি ট্যাক কিক কিক
(খ) বুলবুলি ডাকে	কা কা
(গ) কোকিল ডাকে	টুট টুট চিরুক চিরুক
(ঘ) টিয়া ডাকে	টিট টিট টুইটি টুট
(ঙ) টুনটুনি ডাকে	কুউ–উ–উ, কুউ–উ–উ

৬. শব্দ আছে পাতায় পাতায়। ঠিক শব্দ খুঁজে বের করি। নিচের খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

টিয়া.....পাখি। নরম সুরে.....বাজাতে পারে দোয়েল। মিষ্টি সুরে গান গায়..... ও .....। লড়াই করতে পারে.....পাখি। দরজি পাখি.....। বাবুই হচ্ছে.....পাখি।

৭. শব্দগুলো খেয়াল করি। এগুলো পাখিদের রং ও গুণের কথা বোঝাচ্ছে।

লড়াকু, সবুজ, ছোট্ট, নরম, সুন্দর

এবার শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করা শিখি।

লড়াকু – বুলবুলি একটি লড়াকু পাখি।
সবুজ – আমাদের স্কুলের মাঠটি সবুজ ঘাসে ভরা।
ছোট্ট – চড়ুই একটি ছোট্ট পাখি।
নরম – বিড়াল নরম বিছানা পছন্দ করে।
সুন্দর – টিয়া একটি সুন্দর পাখি।

৮. বাক্যগুলো খেয়াল করে পড়ি। ঠিক জায়গায় কমা, দাড়ি ও প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে খাতায় লিখি।

আমাদের দেশে আছে কত রকমের পাখি
আর কত যে তাদের নাম
মিষ্টি সুরে গান করে কোকিল ময়না ও দোয়েল
রবি আমি অনেক পাখি দেখেছি
তুমি কি পাখি দেখেছ
তুমি কী কী পাখি দেখেছ

৯. কয়েকটি চেনা পাখির ছবি দেখি। যেকোনো একটি পাখি সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখি।

আমাদের গ্রাম

বন্দে আলী মিঞা

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতামাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।

আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পুব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলো জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

সেথা	– সেখানে।	থাকি সেথা সবে মিলে (সেখানে সবাই মিলে মিশে থাকি) নাহি কেহ পর।
পাঠশালা	– বিদ্যালয়।	সেকালে শিশুদের পড়ার পাঠশালা ছিল।
কিরণ	– আলো।	চাঁদের কিরণে চারদিক আলোকিত।
আত্মীয়	– আপনজন।	ছুটিতে আমরা আত্মীয়–স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাই।
হেন	– এরূপ। এরকম।	এ হেন কাজ করতে নেই।

২. নিচের বাক্যগুলোতে শহর ও গ্রামের কথা বলা হয়েছে। শহর ও গ্রামের কথাগুলো আলাদা করে লিখি।

বাতাসে ধানের চারা দোল খায়। বিলে শাপলা ফোটে। চারদিকে অনেক দালানকোঠা। বাঁশবাগানের ওপর চাঁদ হাসে। রাস্তায় সারাদিন গাড়ি চলে। লোকজন অফিসে যায়।

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) পাড়ার সকল ছেলে একসঙ্গে কী করে ?

১) মাছ ধরে
২) বাজারে যায়
৩) বেড়াতে যায়
৪) খেলাধুলা করে

(খ) কোন কাজ থেকে আমরা নিজেকে বিরত রাখব?

১) একসঙ্গে খেলা করা
২) মারামারি করা
৩) বিদ্যালয়ে যাওয়া
৪) গুরুজনকে ভয় করা

(গ) গ্রামকে মায়ের সমান বলা হয়েছে কেন?

১) সবাই মিলেমিশে থাকে বলে
২) সবাইকে মায়া–মমতা দেয় বলে
৩) সব গাছ আত্মীয়ের মতো বলে
৪) সবকিছু মিলে গ্রামটি সুন্দর বলে

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

জলভরা – জলভরা দিঘি টলমল করে।
মাঠভরা – মাঠভরা ফসল দেখে চাষির মন খুশিতে ভরে ওঠে।
ঝিকিমিকি – চাঁদের আলোতে চারদিক ঝিকিমিকি করে।
বাঁশঝাড় – রাতের বেলায় বাঁশঝাড়ে হুতোম পেঁচা ডাকে।

৫. বাম দিকের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের শব্দ মেলাই

আপন	আঁধার
মিলে	রবি
সোনার	ঝাড়
পাখি	পর
বায়ু	মিশে
বাঁশ	ডাকে
	বয়

৬. একই অর্থের শব্দ জেনে নিই।

চাঁদ – চন্দ্র, শশী, সুধাকর।
রবি – সূর্য, দিনমণি, দিবাকর।
বায়ু – বাতাস, হাওয়া, পবন।

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) গাঁয়ের ঘরগুলো দেখতে কেমন ?
(খ) সেখানে লোকজন কীভাবে থাকে ?
(গ) ছেলেমেয়েরা একসাথে কোথায় যায় ?
(ঘ) গ্রামের গাছপালা দেখলে কী মনে হয় ?
(ঙ) সকালে গাঁয়ে কী কী ঘটে?

৮. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও আবৃত্তি করি।

৯. আমার গ্রাম বা শহর সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখি।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ

গ্রামের নাম শীতলপুর। তপুর মামাবাড়ি। গ্রামখানি ছবির মতো সুন্দর। প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তপু মামাবাড়ি যায়। সাথে বাবা, মা আর বড় বোন কান্তা। শহর ছেড়ে দূরে কয়েকটা দিন খুব আনন্দে সময় কাটে।

গ্রামে তপু আর কান্তার অনেক বন্ধু। মামাতো ভাইবোন রিতু, সোমা আর জিশান তো আছেই। আরও আছে পাশের বাড়ির কনক, শিহাব, সুবিমল, কেয়া, রাতুল এবং আরও অনেকে। সবাই একসাথে হইচই আর আনন্দে সময় কাটায়। দুপুরে বাগানে মিছিমিছি বনভোজন হয়। বিকেলে হয় খেলা। আর রাতে উঠোনে মাদুর পেতে গল্প।

এবার গ্রামে তপু একটা নতুন খেলা শিখল। নাম কানামাছি। কী যে মজার খেলা! অনেকে মিলে একসাথে খেলা যায়। সেদিন খেলার শুরুতে রাতুলের দু চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল সোমা। এমনটাই নিয়ম। তবে প্রথমে কার চোখ বাঁধা হবে সেটা নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হয়। পলাশ পাশ থেকে বলল, রাতুল সব দেখতে পাচ্ছে। সোমা আপু, তুমি শক্ত করে বাঁধোনি।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেল। তপুর মনে খুব আনন্দ। একটা নতুন খেলা শেখা হলো। আরও খেলতে ইচ্ছে করছিল ওর। ইস, আজ একবারও ওর চোখ বাঁধা হলো না। মনে মনে ভাবল, এবার স্কুলে ক্লাসের বন্ধুদের এ খেলা শেখাবে। তারপর সবাই মিলে একসাথে খেলবে।

সন্ধ্যার পর আকাশে চাঁদ উঠল। উঠান জুড়ে হালকা জোছনা। বাড়ির বড়দের সাথে সাথে ছোটরাও উঠানে বসেছে। সবাই গল্প করছে। হঠাৎ তপু বলল, চলো না কানামাছি খেলি।

তপুর কথা শুনে হেসে উঠল সবাই।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

গ্রীষ্ম	– গরমের কাল।	বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল।
মিছেমিছি	– কোনো কারণ ছাড়া, খামোখা।	মিছেমিছি তিনি ছুটে এসেছেন।
বনভোজন	– চড়ুইভাতি।	আমরা কাল বনভোজনে গিয়েছিলাম।
ঝাঁক	– পাখি, মাছ, মাছি ইত্যাদির দল।	ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে।
ছড়া	– এক ধরনের ছোট কবিতা।	মা আমাকে ছড়া শিখিয়েছেন।
শৈশব	– ছোটবেলা, শিশুকাল।	আমার শৈশব কেটেছে মামার বাড়িতে।
জোছনা	– চাঁদের আলো।	জোছনা রাতে দাদি আমাদের গল্প শোনান।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেল। তপুর মনে খুব আনন্দ। একটা নতুন খেলা শেখা হলো। আরও খেলতে ইচ্ছে করছিল ওর। ইস, আজ একবারও ওর চোখ বাঁধা হলো না। মনে মনে ভাবল, এবার স্কুলে ক্লাসের বন্ধুদের এ খেলা শেখাবে। তারপর সবাই মিলে একসাথে খেলবে।

সন্ধ্যার পর আকাশে চাঁদ উঠল। উঠান জুড়ে হালকা জোছনা। বাড়ির বড়দের সাথে সাথে ছোটরাও উঠানে বসেছে। সবাই গল্প করছে। হঠাৎ তপু বলল, চলো না কানামাছি খেলি।

তপুর কথা শুনে হেসে উঠল সবাই।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

গ্রীষ্ম	– গরমের কাল।	বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল।
মিছেমিছি	– কোনো কারণ ছাড়া, খামোখা।	মিছেমিছি তিনি ছুটে এসেছেন।
বনভোজন	– চড়ুইভাতি।	আমরা কাল বনভোজনে গিয়েছিলাম।
ঝাঁক	– পাখি, মাছ, মাছি ইত্যাদির দল।	ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে।
ছড়া	– এক ধরনের ছোট কবিতা।	মা আমাকে ছড়া শিখিয়েছেন।
শৈশব	– ছোটবেলা, শিশুকাল।	আমার শৈশব কেটেছে মামার বাড়িতে।
জোছনা	– চাঁদের আলো।	জোছনা রাতে দাদি আমাদের গল্প শোনান।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

গ্রাম	–	গ্র	=	গ	+	র-ফলা (্র)	গ্রহ, অগ্র
গ্রীষ্ম	–	ষ্ম	=	ষ	+	ম	উষ্ম
জিজ্ঞেস	–	জ্ঞ	=	জ	+	ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞ

৩. ঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন দিই।

(ক) প্রথমে কার চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়েছিল ?

১) শিহাবের ২) সুবিমলের
৩) কেয়ার ৪) রাতুলের

(খ) রাতে উঠানে মাদুর পেতে সবাই কী করে ?

১) খেলে ২) ঘুমায়
৩) পড়ে ৪) গল্প করে

৪. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই।

বড়	–	ছোট
অনেক	–	অল্প
নতুন	–	পুরনো
শক্ত	–	নরম
সামনে	–	পেছনে
এদিক	–	ওদিক

৫. বাক্যগুলো পড়ি। অবস্থান বোঝানো শব্দ জেনে নিই।

আমরা বাগানে বনভোজন করছি।
ওরা উঠানে গল্প করছে।
মাঠে খেলা চলছিল।
সন্ধ্যার পর আকাশে চাঁদ উঠল।

বাগানে, উঠানে, মাঠে, আকাশে – এগুলো অবস্থান বোঝানো শব্দ। কোন কাজ কোথায় হচ্ছে সেটা বোঝাতে বাক্যে অবস্থানবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) তপুর মামাবাড়ি কোথায় ?
(খ) সবাই কখন খেলা করে ?
(গ) নতুন শেখা খেলার নাম কী ?
(ঘ) রাতুলের চারপাশে সবাই কিসের মতো ঘুরতে লাগল ?
(ঙ) সবাই কখন বাড়ি ফিরে গেল ?

৭. শব্দ খুঁজি। মালা বানাই।

এটি একটি শব্দখেলা। দুজন বা কয়েকজন মিলে এটি খেলা যায়। খেলার নিয়ম এ রকম – প্রথম জন একটা শব্দ বলবে। যেমন : আম।

দ্বিতীয় জন আম শব্দটা বলে আমের শেষ বর্ণ দিয়ে একটা শব্দ তৈরি করবে। যেমন, আম – মশা।

তৃতীয় জন এ দুটো শব্দ উচ্চারণ করে নতুন শব্দের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করবে। যেমন, আম – মশা – শামুক।

এভাবে আবার প্রথম জনের পালা আসবে। সে বলবে, আম – মশা – শামুক – কলা।

এরপর দ্বিতীয় জনের পালা। সে বলবে, আম – মশা – শামুক – কলা – লাউ।

এবার তৃতীয় জন বলবে, আম – মশা – শামুক – কলা – লাউ – উট।

এভাবে শব্দের মালা তৈরির খেলা চলবে। শব্দমালার প্রতিটি শব্দ ধারাবাহিকভাবে বলতে হবে। কেউ না পারলে সে বাদ যাবে। তখন পরের জনের পালা আসবে। এভাবে এক এক জন ঝরে পড়ার পর শেষ জন বিজয়ী হবে।

আদর্শ ছেলে

কুসুমকুমারী দাশ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ?
মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন
'মানুষ হতেই হবে' এই যার পণ।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ ?
হাত পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয় ?
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয় ?
সে ছেলে কে চায় বল, কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায় ?
মনে প্রাণে খাটো সবে, শক্তি কর দান,
তোমরা 'মানুষ' হলে দেশের কল্যাণ।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

আদর্শ	– অনুসরণীয়। মেনে চলার যোগ্য।	আমাদের আদর্শ মানুষ হতে হবে।
কবে	– কখন।	কবে তুমি বাড়ি যাবে?
বল	– শক্তি।	কঠিন কাজে মনের বল দরকার।
তেজ	– শক্তি। জোর।	যখন তখন তেজ দেখানো ভালো নয়।
পণ	– প্রতিজ্ঞা। শপথ।	দেশের ভালোর জন্যে আমাদের পণ করা উচিত।
চেতনা	– জ্ঞান। বোধ।	মানুষের চেতনা আছে, পাথরের নেই।
খাটা	– পরিশ্রম করা।	খুব খাটা হয়েছে, এখন বিশ্রাম নাও।
কল্যাণ	– মঙ্গল। ভালো।	আমরা দেশের কল্যাণ করতে চাই।

২. বুঝে নিই।

কথায় না বড় হয়ে	–	মুখে বড় বড় কথা না বলে।
কাজে বড় হওয়া	–	ভালো কাজ করে সুনাম অর্জন করা।
তেজে ভরা মন	–	মনের মধ্যে জোর থাকা।
মানুষ হতেই হবে	–	মানুষের মতো মানুষ হতে হবে।
মিছে কেন ভয় ?	–	অযথা ভয় না করা।
চেতনা রয়েছে যার	–	ভালো কিছু করার ভাবনা।
সে কি পড়ে রয় ?	–	সে অলস সময় কাটায় না।
মাথা ঘুরে যায়	–	দিশেহারা হয়ে যায়।
দেশের কল্যাণ	–	দেশের ভালো হয় এমন কিছু।

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) দেশের জন্য কী রকম ছেলে চাই ?

১) কাজে নয় কথায় বড়
২) কথায় নয় কাজে বড়
৩) কথা বেশি কাজ কম
৪) কথা কম কাজ কম

(খ) হাত পা সবারই আছে মিছে কেন ভয় – কবি কেন এ কথা বলেছেন ?

১) সাহস যোগাবার জন্য
২) শক্তি অর্জনের জন্য
৩) বুদ্ধি দেওয়ার জন্য
৪) চরিত্রবান হওয়ার জন্য

(গ) ছেলেরা 'মানুষ' হলে কী উপকার পাওয়া যাবে ?

১) সবাই ধনী হবে
২) সুখে দিন কাটাবে
৩) দেশের কল্যাণ হবে
৪) বিদেশে গমন করবে

(ঘ) কবি কোন ধরনের ছেলে প্রত্যাশা করেন ?

১) কথায় কথায় যার চোখে জল আসে
২) অল্পতেই যার মাথা ঘুরে যায়
৩) যার চেতনা রয়েছে
৪) সবার সামনে যে সংকুচিত থাকে

৪. পরের চরণটি মিলিয়ে পড়ি।

(ক) আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে

_____

(খ) সে ছেলে কে চায় বল, কথায় কথায়

_____

(গ) মনে প্রাণে খাটো সবে, শক্তি কর দান,

_____

(ঘ) হাত পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয় ?

_____

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

মানুষ, বিপদ, শরীর, চেতনা, কল্যাণ

৬. মানুষের শরীর বিষয়ক শব্দ জেনে নিই।

হাত, পা, মাথা, মুখ, বুক, চোখ, কান, নাক, পেট, পিঠ, কোমর, চুল

৭. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাম দিকের শব্দের সঙ্গে মিলাই।

ছেলে	ছোট
বড়	মেয়ে
হাসি	পা
বিপদ	বিদেশ
দেশ	আপদ
চোখ	কান্না
হাত	কান

৮. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) আমাদের দেশের ছেলেরা কিসে বড় হবে ?
(খ) আমাদের ছেলেরা কী পণ করবে ?
(গ) বিপদ এলে ছেলেরা কী করবে ?
(ঘ) কোন ছেলেরা পিছিয়ে পড়ে না ?
(ঙ) কেমন ছেলেকে কেউ চায় না ?
(চ) ছেলেদের কীভাবে খাটতে হবে ?
(ছ) কেমন করে দেশের কল্যাণ হবে ?

৯. কবিতাটি সবাই মিলে বারবার পড়ি।

একজন পটুয়ার কথা

১৯৪৫ সাল। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সারা বাংলায় ব্যায়াম ও শরীরচর্চা প্রতিযোগিতার খবর। তাতে প্রথম হয়েছেন একজন শিল্পী। ছবি আঁকার স্কুলে পড়েন তিনি। তিনি 'মিস্টার বেঙ্গল' হয়েছেন। পত্রিকায় ছবি বের হলো। চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। এভাবে যিনি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন। তিনি শিল্পী কামরুল হাসান।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে।

১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধের বছর। পাকিস্তানি সেনাশাসক ইয়াহিয়া ক্ষমতায়। তার নির্দেশেই বাংলাদেশে দানবীয় গণহত্যা হয়। তার চেহারাকে দানবের মতো করে আঁকলেন তিনি। আবার হইচই পড়ে গেল। বাংলাদেশের মানুষ আবার তাঁকে নতুনভাবে জানতে পারল। ইনি সেই শিল্পী কামরুল হাসান। পরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা করেছেন তিনি।

নাইজর

তাঁর জন্ম কলকাতায়। সেখানে তাঁর বাবা চাকরি করতেন। তাঁদের বাড়ি বর্ধমান জেলার নারেঙ্গা গ্রামে। বাবার নাম মোহাম্মদ হাশিম। মায়ের নাম আলিয়া খাতুন।

ছোটবেলায় তিনি যে স্কুলে পড়তেন সেখানে ছবি আঁকা শেখানো হতো। এভাবে আঁকার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হলো। বাবা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন কলকাতা মাদরাসায়। কিন্তু তিনি তাতে মন বসাতে পারলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছবি আঁকার স্কুলে পড়বেন। বাবা শেষে বাধ্য হলেন। তাঁকে ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি করালেন। কিন্তু শর্ত দিলেন, পড়ার খরচ তিনি দেবেন না।

কামরুলকে এজন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। পড়ার খরচ জোগাতে তিনি কাজ করেছেন পুতুলের কারখানায়।

তবে কামরুল কেবল ছবি আঁকা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না। পাশাপাশি শরীরচর্চা করেছেন। দেশসেবক তরুণদের সংগঠন ব্রতচারীদের দলে যুক্ত হয়েছেন। তাদের কাছ থেকে পেয়েছেন খাঁটি বাঙালি হওয়ার শিক্ষা। শিখেছেন সততা ও নিয়মানুবর্তিতা। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন। শ্রদ্ধা করেছেন গ্রামের সাধারণ ছবি আঁকিয়েদের। এঁদের 'পটুয়া' বলা হয়। নিজেকে 'পটুয়া' বলে পরিচয় দিতে তাঁর গর্ব হতো। ব্রতচারীদের নিয়মনীতি তিনি মেনে চলেছেন। যেমন, ব্রতচারীদের সতেরো মানার মধ্যে ছিল –

খিচুড়ি ভাষায় বলিব না
ভুলেও ভুড়ি বাড়াইব না
খিদে না থাকিলে খাইব না
বিপদ বাধায় ডরিব না
বিলাসিতা ভাব পুষিব না
রাগ পাইলেও রুষিব না
দুখেও হাসিতে ভুলিব না
দেমাগেতে মনে ফুলিব না
অসত্য চাল চালিব না
দৈবে ভরসা রাখিব না
চেষ্টা না করে থাকিব না
বিফল হলেও ভাগিব না।
ভিক্ষা জীবিকা মাগিব না
কথা দিয়ে কথা ভাঙিব না।

উকি

তিন কন্যা

ব্রতচারীদের এসব শিক্ষা তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। সব সময় তিনি সহজসরল জীবন যাপন করেছেন। কোথাও গেলে সময়মতো যেতেন। দেরি করে যাওয়া তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল না। কামরুল হাসান যুক্ত হয়েছিলেন শিশুকিশোর সংগঠনের সঙ্গে। মুকুল ফৌজের নায়ক ছিলেন। কিশোরদের তিনি ব্যায়াম শেখাতেন। সহজসরল জীবনের কথা তাদের বলেছেন। শিখিয়েছেন সততা। শিখিয়েছেন দেশকে ভালোবাসতে, মানুষকে ভালোবাসতে।

মানুষকে ও দেশকে ভালোবাসতেন তিনি । সেজন্য ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাঁর ছবিতে মানুষ ও দেশের প্রতি ভালোবাসার কথা আছে। 'তিন কন্যা', 'নাইওর', 'উঁকি' ইত্যাদি তাঁর ছবির নাম। এসব ছবিতে ফুটে উঠেছে গ্রামের মানুষের জীবন।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন কামরুল হাসান। কেবল কথায় নয়, প্রতিবাদ করতেন ছবির ভাষাতেও। জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি প্রতিবাদের ছবি এঁকেছেন। তাঁর জীবন থেকে আমাদের শেখার আছে। আমরাও তাঁর মতো দেশকে ভালোবাসব। ছবিকে ভালোবাসব। মানুষকে ভালোবাসব।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

ব্যায়াম	– স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরিক কসরত।	সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়াম করা উচিত।
হইচই	– গোলমাল।	ক্লাসে হইচই করা ঠিক না।
সেনাশাসক	– দেশের শাসক হিসেবে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা।	আইয়ুব খাঁ সেনাশাসক ছিলেন।
নকশা	– চিত্রের কাঠামো। ডিজাইন।	ছবিতে ফুলপাতার নকশা আঁকা হয়েছে।
মাদরাসা	– ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র।	রহমত উল্লাহ মাদরাসায় পড়ে।
দানব	– অসুর, দৈত্য।	খারাপ কাজ করে মানুষও দানব হয়ে ওঠে।

শর্ত	– ধারা।	শর্ত ছাড়া চুক্তি হয় না।
কারখানা	– যে স্থানে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হয়।	কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করে।
ব্রতচারী	– দেশ সেবায় যারা ব্রত পালন করে।	ব্রতচারীরা দেশকে ভালোবাসে।
সততা	– সাধুতা।	সততা মহৎ গুণ।
নিয়মানুবর্তিতা	– নিয়ম মেনে চলা।	ছাত্রছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতা শেখা প্রয়োজন।
পটুয়া	– চিত্রকর। যে পট বা ছবি আঁকে। গ্রামের সাধারণ ছবি আঁকিয়ে।	পটুয়ারা ভালো ছবি আঁকেন।
সংগঠন	– কিছু লোক মিলে গড়ে তোলা দল।	আমরা শিশু সংগঠনে কাজ করি।
মুকুল ফৌজ	– শিশু কিশোর সংগঠনের নাম।	মিতু মুকুল ফৌজের সদস্য।
কিশোর	– ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী ছেলে।	কিশোররা খেলাধুলায় মেতে থাকে।
নাইওর	– বিবাহিতা নারীর বাপের বাড়ি গমন।	বিয়ের পর নতুন বৌ নাইওর যাচ্ছে।
প্রতিবাদ	– বিরোধিতা করা। আপত্তি জানানো।	অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো উচিত।
নায়ক	– নেতা। পরিচালক।	শেরে বাংলা ছিলেন দেশনায়ক।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

বেঙ্গল	–	ঙ্গ	=	ঙ	+	গ	অঙ্গ, বঙ্গ
ব্যস্ত	–	স্ত	=	স	+	ত	সমস্ত, তিস্তা

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) কামরুল হাসান 'মিস্টার বেঙ্গল' হয়েছিলেন কোন প্রতিযোগিতায় ?
১) ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় ২) ব্যায়াম ও শরীরচর্চা প্রতিযোগিতায়
৩) গান রচনার প্রতিযোগিতায় ৪) ব্রতচারী নৃত্য প্রতিযোগিতায়

(খ) ব্রতচারী দলে যুক্ত হয়ে কামরুল হাসান কী কী শিখেছেন ?
১) ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা ২) সততা ও নিয়মানুবর্তিতা
৩) জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ৪) রাজনীতি ও সমাজনীতি

(গ) কামরুল হাসান কার চেহারাকে দানবের মতো করে এঁকেছিলেন ?
১) আইয়ুবের ২) ইয়াহিয়ার
৩) ভুট্টোর ৪) মোনায়েম খাঁর

(ঘ) কোনটি কামরুল হাসানের চিত্র ?
১) সংগ্রাম ২) রোপণ
৩) নাইওর ৪) কবুতর

৪. শূন্যস্থান পূরণ করি।

(ক) চারদিকে ——— পড়ে গেল।
(খ) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত ——— করেছেন তিনি।
(গ) নিজেকে ——— বলে পরিচয় দিতে তাঁর গর্ব হতো।
(ঘ) তিনি ——— জীবন যাপন করেছেন।

নকশা
পটুয়া
সহজসরল
হইচই
হইহই

৫. কতগুলো শব্দ ভেঙে দেখাই।

শরীরচর্চা – শরীরের চর্চা। শরীরচর্চা করলে মানুষ সুস্থ থাকে।
দেশসেবক – দেশের সেবক। দেশসেবকরা দেশের মানুষকে ভালোবাসে।
নিয়মনীতি – নিয়ম ও নীতি। সকলেরই নিয়মনীতি মেনে চলা উচিত।
সহজসরল – সহজ ও সরল। সহজসরল জীবন যাপন করাই ভালো।

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই।

বাবা	–	মা
দানব	–	দেবতা
কষ্ট	–	আরাম
চূড়ান্ত	–	প্রাথমিক
খাঁটি	–	নকল

৭. নিচের শব্দগুলো এ রচনায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তা গুনে লিখি।

(ক) শিল্পী – তিন বার
(খ) ছবি –
(গ) হইচই –
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধ –
(ঙ) আঁকা –
(চ) পটুয়া –
(ছ) ব্রতচারী –
(জ) কলকাতা –

৮. বাক্যে প্রশ্নশব্দের ব্যবহার জেনে নিই। কি, কী, কে, কেন, কখন, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নশব্দ ব্যবহার করে প্রশ্নবাক্য তৈরি করতে হয়। নিচের উদাহরণগুলো দেখি।

১) কামরুল হাসান কি ছবি আঁকার স্কুলে পড়তেন ?
২) তাঁর বাবা কী করতেন ?
৩) কে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা করেছেন ?
৪) কোন শহরে কামরুল হাসানের জন্ম ?
৫) কখন তিনি 'মিস্টার বেঙ্গল' হন ?
৬) কামরুল হাসানের বাড়ি কোথায় ?

এবার প্রশ্নশব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করি।

৯. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

(ক) কামরুল হাসান 'মিস্টার বেঙ্গল' হন কীভাবে ?
(খ) কামরুল হাসানের জন্ম কোথায় ?
(গ) কামরুল হাসানের গ্রামের নাম কী ?
(ঘ) পড়ার খরচ জোগাতে কামরুল হাসান কোথায় কাজ করেছেন ?
(ঙ) কোন সংগঠনে যুক্ত হয়ে কামরুল হাসান দেশসেবার দীক্ষা নিয়েছেন ?
(চ) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা এঁকেছেন কে ?
(ছ) কামরুল হাসান নিজেকে পটুয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন কেন ?
(জ) ব্রতচারীদের সতেরো মানার মধ্যে তিনটি লিখি।
(ঝ) কামরুল হাসানের তিনটি ছবির নাম লিখি।

১০. প্রশ্নগুলোর তিনটি করে উত্তর লিখি।

(ক) ব্রতচারীদের কাছ থেকে কামরুল হাসান কী কী শিখেছেন ?
(খ) মুকুল ফৌজের সদস্যদের কামরুল হাসান কী কী শিখিয়েছেন ?

ঘুড়ি

আবুল হোসেন

ঘুড়িরা উড়িছে বন মাথায়
হলদে সবুজে মন মাতায়
গোধূলির ঝিকিমিকি আলোয়
লাল সাদা আর নীল কালোয়,
ঘুড়িরা উড়িছে হালকা বায়।

ঘুড়িরা উড়িছে হালকা বায়,
একটু বাড়িলে টান সুতায়,
আকাশে ঘুড়িরা হোঁচট খায়
সামলে তখন রাখা যে দায়
উঠিছে নামিছে টাল মাটাল

ভারি যে কঠিন ঘুড়ির চাল,
সাধ্যি কি চিল পায় নাগাল।
প্যাঁচ লেগে ঘুড়ি কেটে পালায়
আকাশের কোথা কোন কোনায়
ঘুড়িরা পড়েছে হাতেতে কার,
খবর রেখেছে কেউ কি তার ?

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

গোধূলি	– সূর্য ডোবার সময়।	গোধূলি বেলায় আকাশ নানা রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।
হোঁচট	– চলার সময় পা আটকে যাওয়া।	সাবধানে চলো, ভাঙা রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়বে।
চাল	– কৌশল।	ঘুড়ি ওড়াতে নানা চাল খাটাতে হয়।

২. কথাগুলো বুঝে নিই।

বন মাথায়	– বনের মাথায়।
মন মাতায়	– মনকে মাতায়।
হালকা বায়	– হালকা বাতাসে।
টাল মাটাল	– টলমল অবস্থা। পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।
নাগাল পাওয়া	– ধরতে পারা। কাছে যেতে পারা।

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) আকাশে ঘুড়িরা কী করে ?

১) ঘুরে বেড়ায় ২) প্যাঁচ লাগায়
৩) হোঁচট খায় ৪) ছুটে পালায়

(খ) কখন ঘুড়ির অবস্থা টালমাটাল হয় ?

১) সন্ধ্যার অল্প আলোয় ২) সুতার টান বাড়লে
৩) বাতাসের বেগ বাড়লে ৪) প্যাঁচ লেগে কেটে গেলে

(গ) চিলেরা ঘুড়ির নাগাল পায় না। কারণ –

১) বাতাসে ঘুড়ি টালমাটাল হয়। ২) চিলের চেয়ে ঘুড়ি উঁচুতে ওড়ে।
৩) ঘুড়ি কৌশলে ওড়ানো হয়। ৪) ঘুড়ি কেটে অনেক দূরে যায়।

৪. উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) কবি কত রঙের ঘুড়ির কথা বলেছেন ?
(খ) ঘুড়ি কোথায় উড়ে যায় ?
(গ) ঘুড়ি যখন অনেক উপরে ওঠে তখন কেমন অবস্থা হয় ?
(ঘ) ঘুড়ি কেটে যাওয়ার পরে কোথায় যায় ?

৫. আমি কত রকমের ঘুড়ি দেখেছি ? কোন রকমের ঘুড়ি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে ? কেন ?

৬. ডান দিকের প্রতি সারিতে দুটি করে কথা আছে। বাম দিকের কবিতায় চরণের খালি জায়গায় ঠিক কথাটি বসাই।

(ক) হলুদে সবুজে ———— নীল কালোয় / মন মাতায়
(খ) একটু বাড়িলে ———— টান সুতায় / হোঁচট খায়
(গ) উঠিছে নামিছে ———— ঘুড়ির চাল / টাল মাটাল
(ঘ) প্যাঁচ লেগে ঘুড়ি ———— কোথায় যায় / কেটে পালায়

৭. বানান ও অর্থের পার্থক্য মনে রাখি।

ভারি – খুব। ভারি চমৎকার।
ভারী – বেশি ওজনের। ভারী বোঝা।

৮. ঘুড়ি বানানো বা ওড়ানোর কথা মুখে বলি।

৯. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

১০. কবিতাটি মুখস্থ লিখি।

স্টিমারের সিটি

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। অনেক দিন স্কুলে ছুটি থাকবে। বাবা মা এই ছুটিতে ঢাকার বাইরে কোথাও বেড়ানোর কথা বললেন। আমরা আনন্দে নেচে উঠলাম। ঠিক হলো, আমরা নদীপথে চাঁদপুর যাব। নদীপথে ভ্রমণের নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করব। বাবা জানালেন, আমাদের ভ্রমণ হবে রকেট স্টিমারে । এটিও আমাদের সকলের জন্য খুবই খুশির খবর। অনেকের কাছে গল্প শুনেছি, রকেট স্টিমারে চড়ার মজাই আলাদা।

শীতের সকাল। আটটার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম ঢাকার সদরঘাটে। বাবা–মার সঙ্গে আমার ছোট ভাই তনু ও ছোট বোন নিনা। সাড়ে আটটায় ছাড়বে স্টিমার। অনেকগুলো কাঠের তক্তা পাশাপাশি রেখে তৈরি করা হয়েছে প্রশস্ত সিঁড়ি। তার ওপর দিয়ে হেঁটে আমরা স্টিমারে উঠলাম। স্টিমার ছাড়ার আগেই আমরা নিচতলা ও দোতলার ডেকে ঘুরে বেড়ালাম। নিচতলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, জাহাজের তলদেশে মেশিন রুম। দোতলার মাঝখানে খোলা একটি ক্যান্টিন। সামনে প্রথম শ্রেণি আর পেছনে দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রীদের

এর মধ্যে হঠাৎ ভোঁ করে স্টিমারের সিটি বাজল। স্টিমার ছাড়ার সময় হলো। স্টিমারের দু পাশে চাকা। চাকার অর্ধেকটা পানির মধ্যে, বাকিটা ওপরে। দুটো চাকা ঘুরে স্টিমারকে সচল করে তুলল। এটি দেখার মতো একটি দৃশ্য। মেশিন ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কয়লা পুড়িয়ে চলছে মেশিন। এ স্টিমারের বয়স প্রায় একশো বছর।

স্টিমার ক্রমশ সদরঘাট পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর ব্রিজ। তার নিচ দিয়ে স্টিমার যাচ্ছে। সেও এক সুন্দর দৃশ্য।

বুড়িগঙ্গার দু পাড়ের দৃশ্য দেখে দেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। তারপর এক সময় এলো মুন্সিগঞ্জ। দেখা গেল ধলেশ্বরী নদীর মোহনা। তারপর আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল নারায়ণগঞ্জ। পৌঁছে গেলাম শীতলক্ষ্যা নদীর মোহনায়। দু পাশে শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে স্টিমার এক সময় মেঘনা নদীতে পড়ল। দু তীরের দৃশ্যে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। একদিকে শ্যামল শস্যের বিস্তীর্ণ মাঠ। আরেক দিকে দূরে ঘন গাছপালায় ঘেরা গ্রাম। মাঝখানে নদীর বিপুল জলধারা। সে এক মনোরম দৃশ্য।

স্টিমার যতই এগোচ্ছে নদী ততই প্রশস্ত হচ্ছে। শীতের নদী যদিও শান্ত তবু ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। আবার পরক্ষণেই সেসব ঢেউ ভেঙে ফেনায় পরিণত হচ্ছে। নদীর পানির ওপরে সাদা গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা কখনো ঝাঁক বেঁধে স্টিমারের পেছনে পেছনে উড়ে চলেছে। নদীতে দেখা যাচ্ছে এক ধরনের প্রাণী। তারা পানির ওপর একটু উঠেই আবার ডুবে যাচ্ছে। বাবা বললেন, এগুলোর নাম শুশুক।

নদীতে চলাচল করছে নানা আকারের নৌকা, ট্রলার ও লঞ্চ। নৌকায় করে জেলেরা মাছ ধরছে। ট্রলারে যাচ্ছে নানা পণ্য। লঞ্চে চড়েছে যাত্রীরা। সামনে নৌকা এসে পড়লে স্টিমারের সিটি বেজে ওঠে। নৌকা সরে গেলে তরতর করে এগিয়ে চলে স্টিমার।

তনু সঙ্গে এনেছে বাইনোকুলার, নিনা এনেছে ক্যামেরা। তনু বাইনোকুলার দিয়ে নদী ও নদীতীরের দৃশ্য দেখছে। আর নিনা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে। স্টিমার এখন চলছে নদীর তীর ঘেঁষে। তীরের ঘরবাড়িগুলো খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে। নিনা নদীতীরের নানা ছবি তুলছে ক্যামেরায়। দেখা যাচ্ছে নদীর ঘাটে মানুষ গোসল করছে। কোথাও ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটছে। মহিলারা কাপড় ধুচ্ছে। কোথাও কৃষক গোরুকে গোসল করাচ্ছে। কোনো ঘাটে আবার যাত্রীবাহী নৌকা ভেড়ানো। যাত্রীরা তাতে ওঠানামা করছে।

আমি, তনু ও নিনা এক সময় উঠে গেলাম স্টিমারের ছাদে। একটু ভয় ভয় করলেও সাহস করে উঠলাম। ছাদে অনেক বাতাস। তাতে দেহমন জুড়িয়ে গেল। ছাদ থেকে নদী আরও ভালোভাবে দেখা যায়। ছাদে রয়েছে কাপ্তানের একটি ছোট ঘর। সেখান থেকেই তিনি স্টিমারের সিটি বাজাচ্ছেন। স্টিমারের দিক পরিবর্তন করছেন। স্টিমারের গতি বাড়ানো কমানোর ব্যাপারে মেশিন রুমে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। এসব দেখে আমাদের খুব ভালো লাগল।

এমন সময় দেখি, আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বাবা–মা। তাঁরা আমাদের ডাকতে এসেছেন নাশতা খেতে। তাঁদের সঙ্গে আমরা দোতলায় নামলাম। সেখানে সুন্দর একটা ক্যান্টিন। আমরা সেখানে ডিম পরটা ও চা খেলাম। ক্যান্টিন থেকে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। হঠাৎ চোখ পড়ল বাইরের দিকে। মেঘনা নদী যেখানে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে সেখানে এসে গেল স্টিমার। সেখানে এক তীর থেকে আরেক তীর আর দেখা যায় না। শুধু পানি আর পানি। এর কাছেই চাঁদপুর। শীতের নদী শান্ত থাকার কথা। কিন্তু পদ্মা

মেঘনার সংযোগস্থলে শীতকালেও নদীর জল উত্তাল। নদীর স্রোতও প্রবল। সেখানে বড় বড় ঢেউ। স্টিমার চলে এলো চাঁদপুরের কাছে। বন্দর দেখা যাচ্ছে। চাঁদপুর ইলিশ মাছ ও নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত। মেঘনা নদী থেকে স্টিমার ঢুকবে একটি ছোট নদীতে। চাঁদপুরের স্টিমার ঘাট ওই নদীর তীরে। নদীটির নাম ডাকাতিয়া। নদীতে খুবই স্রোত। এই নদীতে প্রবেশের পর স্টিমারের গতি কমে গেল। আবার বেজে উঠল স্টিমারের সিটি। ধীরে ধীরে ঘাটে এসে ভিড়ল স্টিমার। এর মধ্যে শুরু হলো লাল জামা পরা কুলিদের হইচই। এবার আমাদের নামার পালা। শেষ হলো আমাদের ভ্রমণ।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

ভ্রমণ	– বেড়ানো।	ভ্রমণে আনন্দ হয়।
অভিজ্ঞতা	– দেখা ও জানার মাধ্যমে লাভ করা জ্ঞান।	নতুন নতুন জায়গা দেখলে অভিজ্ঞতা হয়।
প্রশস্ত	– চওড়া। প্রসারিত। বিস্তৃত।	ঢাকার রাস্তাগুলি অনেক প্রশস্ত।
তলদেশ	– যে অংশ সবচেয়ে নিচে অবস্থিত।	জাহাজের তলদেশে থাকে নানা পণ্য।
যাত্রী	– যাতায়াত করে এমন। যাত্রাকারী।	সামনে যাত্রী ছাউনি।
শ্যামল	– শ্যাম বা সবুজ বর্ণের।	বাংলার প্রকৃতির রূপ শ্যামল।
শস্য	– ফসল।	মাঠে শস্য ফলে।
বিস্তীর্ণ	– বিশাল। বিরাট।	গ্রামে আছে অনেক বিস্তীর্ণ মাঠ।
জলধারা	– জলের ধারা বা প্রবাহ।	নদীতে আমরা দেখি বিরামহীন জলধারা।

মনোরম	– সুন্দর। মনোজ্ঞ। রমণীয়।	দৃশ্যটি খুবই মনোরম।
পণ্য	– বিক্রির জন্য তৈরি দ্রব্য।	ট্রলারে করে পণ্য বহন করা হয়।
কাপ্তান	– জাহাজের পরিচালক।	জাহাজ চলে কাপ্তানের নির্দেশে।
উত্তাল	– অত্যন্ত আলোড়িত, তরঙ্গময়।	উত্তাল নদীতে নামা বিপজ্জনক।
নদীবন্দর	– নদী তীরবর্তী বন্দর।	নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর হিসেবে বিখ্যাত।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

অভিজ্ঞতা	–	জ্ঞ	=	জ	+	ঞ	বিজ্ঞ, বিজ্ঞান
স্টিমার	–	স্ট	=	স	+	ট	ফাস্ট, লাস্ট
ক্যান্টিন	–	ন্ট	=	ন	+	ট	প্যান্ট, আন্ট
কাপ্তান	–	প্ত	=	প	+	ত	সপ্ত, দীপ্ত
উত্তাল	–	ত্ত	=	ত	+	ত	চিত্ত, বিত্ত

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে লিখি।

(ক) নদীপথে কোথায় যাওয়া ঠিক হলো ?

১) বরিশাল ২) খুলনা
৩) চাঁদপুর ৪) মুন্সিগঞ্জ

(খ) স্টিমারের কোন অংশে প্রথম শ্রেণির কেবিন থাকে ?

১) পেছনে ২) সামনে
৩) মাঝখানে ৪) নিচতলায়

(গ) স্টিমারের পেছনে ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়ায় কোন পাখি ?

১) পায়রা ২) টিয়া
৩) গাংচিল ৪) শালিক

(ঘ) চাঁদপুরের স্টিমার ঘাট কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?

১) পদ্মা ২) মেঘনা

৩) ধলেশ্বরী ৪) ডাকাতিয়া

৪. শূন্যস্থান পূরণ করি।

(ক) রকেট স্টিমারে চড়ার ———————— আলাদা।

(খ) এ স্টিমারের বয়স প্রায় ———————— বছর।

(গ) তারপর এক সময় এলো ————————।

(ঘ) নৌকায় করে ———————— মাছ ধরছে।

একশো
মুন্সিগঞ্জ
জেলেরা
মজাই
পঞ্চাশ

৫. এ রচনায় অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো চিনে নিই।

স্টিমার, ক্যান্টিন, কেবিন, মেশিন, ব্রিজ, ট্রলার, লঞ্চ, বাইনোকুলার, ক্যামেরা

৬. এ রচনায় কতকগুলো শহরের নাম আছে, সেগুলো জেনে নিই।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর

৭. এ রচনায় অনেকগুলো নদীর নাম আছে, সেগুলোর নাম জেনে নিই।

বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা, মেঘনা, পদ্মা, ডাকাতিয়া

৮. জোড় লাগানো শব্দ আলাদা করি।

নদীপথ = নদী + পথ

নিচতলা = নিচ + তলা

জলধারা = জল + ধারা

এবার নিচের শব্দগুলো আলাদা করে দেখাই।

ঘরবাড়ি, ছেলেমেয়ে, নদীতীর, দেহমন, নদীবন্দর

৯. দুটো বাক্য জুড়ে একটা বাক্য তৈরি করি।

(ক) আমরা ডিম পরটা খেলাম।
(খ) আমরা চা খেলাম।

আমরা ডিম পরটা ও চা খেলাম।

(ক) চাঁদপুর ইলিশ মাছের জন্য বিখ্যাত।
(খ) চাঁদপুর নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত।

চাঁদপুর ইলিশ মাছ ও নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত।

এবার নিচের দুটো বাক্য জুড়ে একটি বাক্য তৈরি করি।

নদীর ঘাটে ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটছে।
নদীর ঘাটে মহিলারা কাপড় ধুচ্ছে।

১০. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

(ক) চাঁদপুর কিসের জন্য বিখ্যাত ?
(খ) তনু ও নিনা নদীতীরে কী কী দেখেছিল ?
(গ) মেঘনা ও পদ্মার সংযোগস্থল দেখতে কেমন ?
(ঘ) স্টিমারের পেছনে ঝাঁক বেঁধে ওড়ে কোন পাখি ?
(ঙ) নদীর পানিতে একবার উঠেই ডুবে যায় কোন প্রাণী ?
(চ) স্টিমারে কোন কোন শ্রেণির যাত্রীদের কেবিন আছে ?
(ছ) স্টিমারের সিটি বাজে কেমন করে ?

১১. নদী পাড়ের দৃশ্য সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

পাল্লা দেওয়ার খবর

ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন সাহানা আপা। এমন সময় একটি বিজ্ঞপ্তি নিয়ে এলেন পিয়ন। সাহানা আপা বললেন, তোমাদের জন্যে একটা খবর আছে। পাল্লা দেওয়ার খবর। আপা সেটি সবাইকে পড়ে শোনালেন।

নীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আগামী পঁচিশ তারিখে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে। দুটি বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা নাম দিতে পারবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা 'ক' বিভাগে নাম দেবে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা 'খ' বিভাগে নাম দিতে পারবে।

খেলার বিষয় :

১. ৫০ মিটার দৌড়
২. ১০০ মিটার দৌড়
৩. বিস্কুট দৌড়
৪. মারবেল দৌড়
৫. বস্তা দৌড়
৬. মোরগ লড়াই
৭. অঙ্ক দৌড়
৮. মনে রাখার খেলা

নিয়ম : ১. একজন ছাত্র বা ছাত্রী সর্বমোট তিনটি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
২. যে কেউ 'যেমন খুশি তেমন সাজো' বিষয়ে অংশ নিতে পারবে।

সকল শ্রেণিতে ছক দেওয়া হলো। তাতে প্রতিযোগীর নাম, বিভাগ, শ্রেণি, রোল, খেলার নাম লিখে ছক পূরণ করতে হবে। আগামী তেইশ তারিখের মধ্যে শ্রেণি শিক্ষকের কাছে ছক জমা দিতে হবে।

মাকসুদা বেগম
প্রধান শিক্ষক
নীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঘোষণা শোনার পর শানু ও কবির হাত তুলল। আপা জিজ্ঞাসা করলেন, কী হলো ? একজন বলো। শানু বলল, কীভাবে ছক পূরণ করব আপা ? আপা বললেন, ঠিক আছে। ঘোষণাটি আমি বিজ্ঞাপন বোর্ডে লাগিয়ে দিচ্ছি। আর আমি একটা ছক আমার নামে বোর্ডে পূরণ করে দেখিয়ে দিই। তোমরা সেটা অনুসরণ করো।

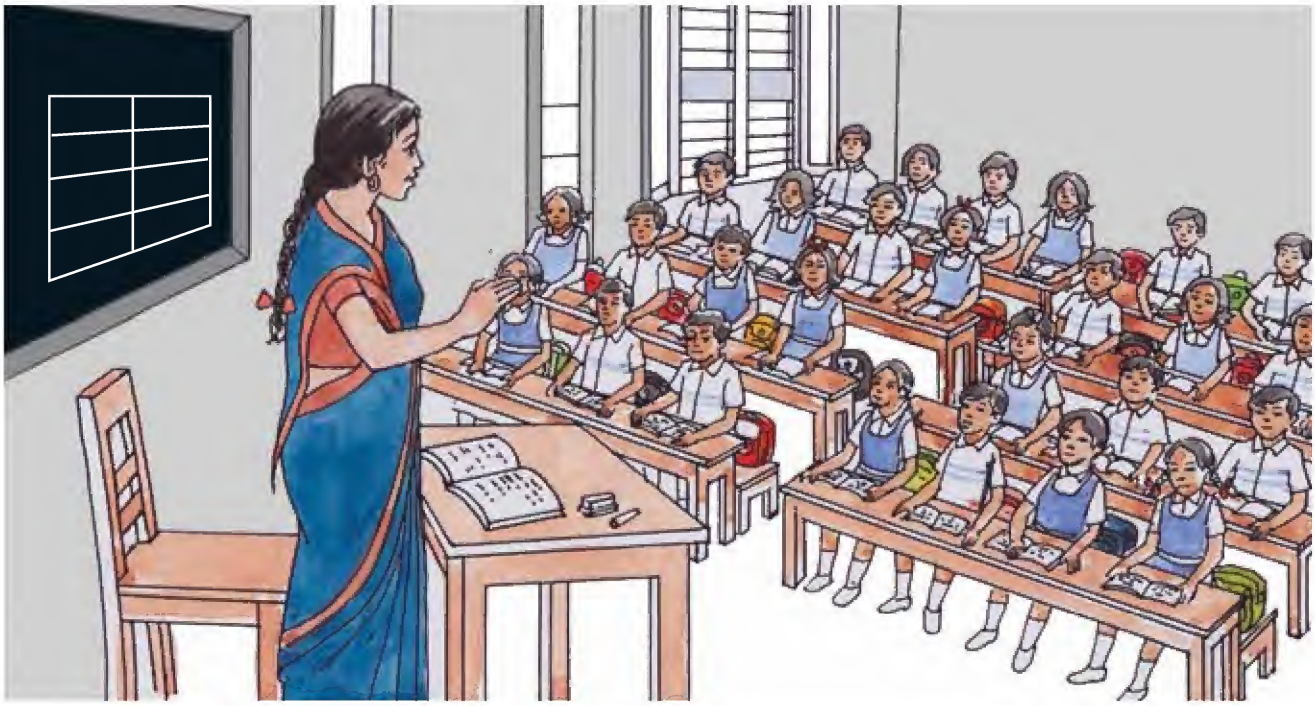

খেলায় নাম দেওয়ার ছক

নাম : সাহানা হক

শ্রেণি : তৃতীয় রোল নম্বর : ৩ বিভাগ : ক

যে খেলা খেলতে ইচ্ছুক তার নাম :

১. ৫০ মিটার দৌড়

২. মোরগ লড়াই

৩. মনে রাখার খেলা

৪. যেমন খুশি তেমন সাজো

পাঠ শিখি

১. ঘোষণা পড়ে নিজে নিজে ছকটি পূরণ করি।

নাম :
শ্রেণি : রোল নম্বর : বিভাগ :

যে খেলা খেলতে ইচ্ছুক তার নাম :

১.
২.
৩.
৪.

২. ক্রমবাচক শব্দগুলি পড়ি ও লিখি।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম দশম

৩. ক্রমবাচক শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

(ক) প্রথম – শিমুল মোরগ লড়াই খেলাতে প্রথম হয়েছে।
(খ) দ্বিতীয় –
(গ) তৃতীয় –
(ঘ) চতুর্থ –
(ঙ) পঞ্চম –
(চ) নবম –

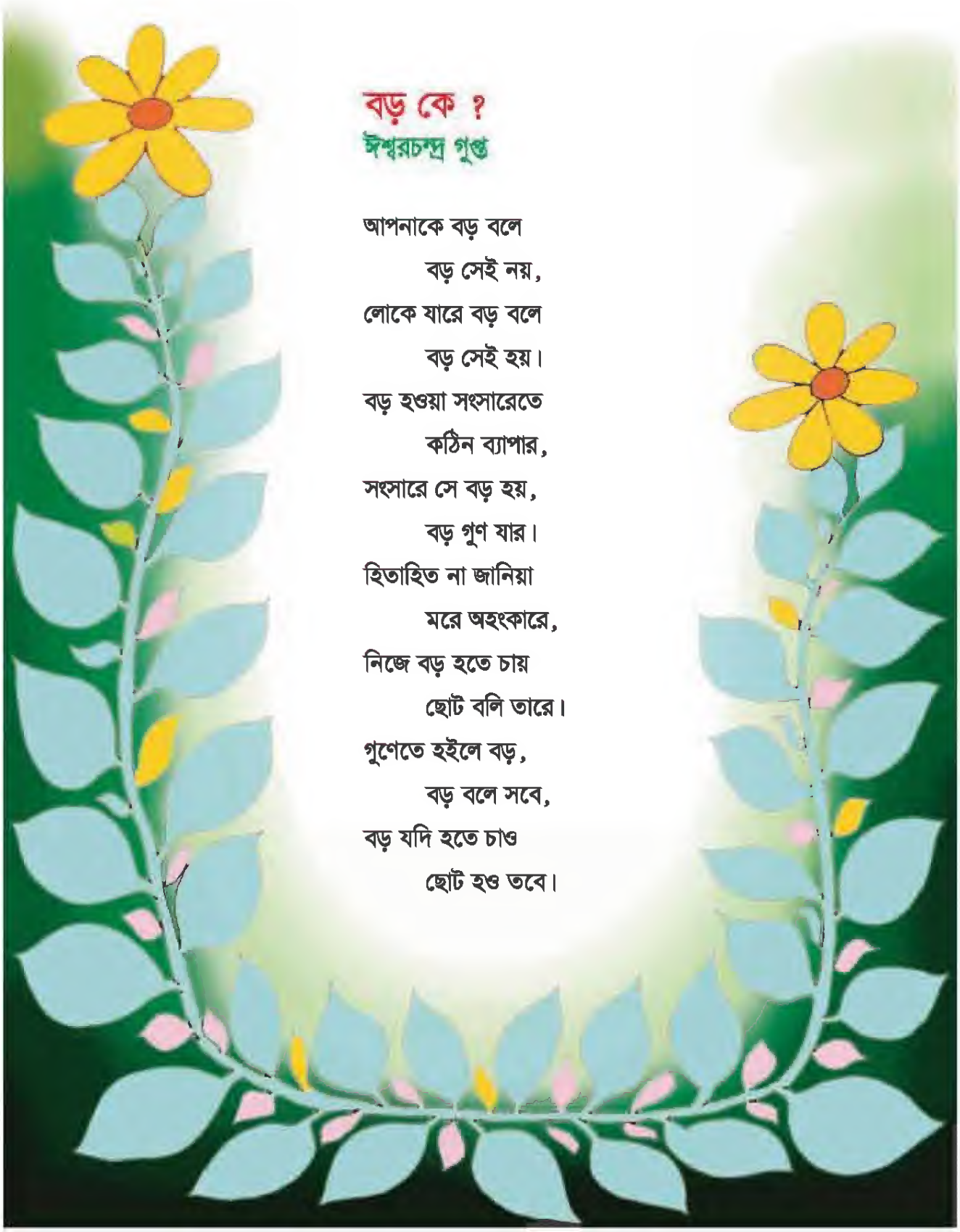

বড় কে ?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আপনাকে বড় বলে
বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে
বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে
কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয়,
বড় গুণ যার।
হিতাহিত না জানিয়া
মরে অহংকারে,
নিজে বড় হতে চায়
ছোট বলি তারে।
গুণেতে হইলে বড়,
বড় বলে সবে,
বড় যদি হতে চাও
ছোট হও তবে।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্য রচনা করি।

কঠিন	– শক্ত।	কখনও কখনও আমাদের কঠিন কাজ করতে হয়।
ব্যাপার	– বিষয়, কাজ।	সে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী ?
হিতাহিত	– ভালোমন্দ।	অনেকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।
অহংকার	– বড়াই।	অহংকার করা ভালো নয়।

২. বুঝে নিই।

সংসারেতে	–	পৃথিবীতে। জীবনে।
বড় যদি হতে চাও	–	জীবনে সফল হতে হলে।
ছোট হও	–	বিনয়ী হও। অহংকার করো না।

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

(ক) প্রকৃত বড় লোক কে ?

১) যে অনেক ধনসম্পদের মালিক ২) লোকে যারে ছোট বলে
৩) যে ধনসম্পদ চায় না ৪) যার বড় গুণ আছে

(খ) নিজের অহংকারে যার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না সে কেমন লোক ?

১) বড়লোক ২) ছোটলোক
৩) ধনীলোক ৪) মূর্খলোক

(গ) সত্যিকারের বড় হতে হলে কী গুণ থাকা দরকার ?

১) নিজেকে ছোট করে দেখা ২) সব কাজে নিজেকে প্রকাশ করা
৩) অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ৪) শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করা

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) বড় কে ?
(খ) সংসারে কীভাবে বড় হওয়া যায় ?
(গ) যে নিজেকে বড় বলে সে আসলে কী ?
(ঘ) কাকে সকলে বড় মনে করে ?

৫. পরের চরণটি বলি।

গুণেতে হইলে বড়,
_____
বড় যদি হতে চাও
_____

৬. বানান ও অর্থের পার্থক্য মনে রাখি।

গুণ – ভালো বৈশিষ্ট্য। ছেলেটির অনেক গুণ আছে।
গুন – নৌকা টানার দড়ি। মাঝি গুন টানছে।

৭. সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. কবিতাটি লিখি।

নিরাপদে চলাচল

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। ছবি আর ইজাজ মায়ের সঙ্গে ঢাকায় এলো। ওদের ছোট মামা জামিল। তাঁর বাসায় উঠল। তারপর বায়না ধরল চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক সবকিছু দেখাতে হবে। মামাতো বোন টিয়ার বয়স পাঁচ বছর। সে বলল, আমিও যাব। জামিল বললেন, শুক্রবারে নিয়ে যাব।

শুক্রবার দুপুরের পর সবাই জামা জুতো পরে তৈরি হলো। মামা ওদের নিয়ে নিজের ছোট্ট গাড়িতে চড়লেন। শুক্রবার হলে কী হবে। ওদের মতো আরও অনেকেই বেরিয়েছে। রাস্তায় বেশ ভিড়। খামারবাড়ি থেকে বের হয়ে ফার্মগেট পার হলো গাড়ি। বাংলা মোটরের সামনেই গাড়ি থামালেন জামিল। ছবি জানতে চাইল, গাড়ি কেন থামল মামা ? জামিল বললেন, ডান দিকে তাকাও। ঐ যে লালবাতি জ্বলছে, একে বলে ট্রাফিক বাতি। লালবাতি জ্বললে গাড়ি সম্পূর্ণ থেমে যাবে। তখন পথচারীরা যেতে পারবে। তারপরে সবুজ বাতি জ্বললে আমরা যেতে পারব।

জামিল রাস্তার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটি উঁচু সেতু দেখালেন। বললেন, ওটাকে বলে ফুটওভার ব্রিজ। লোকজন ওটা দিয়ে হেঁটে রাস্তার এপার থেকে ওপার যাচ্ছে দেখো। ইজাজ বলল, ওরা তো রাস্তা দিয়েই যেতে পারে। জামিল বললেন, সেটা ঠিক নয়। শহরের রাস্তায় দেখো কত গাড়ি চলছে। এখানে রাস্তা পার হওয়া বিপজ্জনক। ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে যাওয়াই নিরাপদ। রাস্তার বাম দিকে একটি থামে বড় সড় একটা বোর্ড দেখালেন। বললেন, ওটা পড়ো। ছবি সরবে পড়ল। রাস্তা পারাপারে ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করুন। নিরাপদ থাকুন।

হঠাৎ টিয়া চিৎকার করে সামনের দিকে দেখাল। সবাই সেদিক তাকাল। আড়াআড়ি পথ দিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি চলছিল। সেখান দিয়ে সাদা ছড়ি হাতে একজন লোক রাস্তা পার হতে যাচ্ছিলেন। লোকটিকে বাঁচাতে জোরে শব্দ করে থামল একটা গাড়ি। একজন ট্রাফিক পুলিশ লোকটিকে রাস্তার কিনারে নিয়ে এলেন। তা দেখে ছবি ভয়ে মুখে হাত চেপে ধরল। বলল, কখনো আমি এভাবে রাস্তা পার হব না। এ সময় আমাদের দিকের সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। জামিল আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলেন। সেটা চলল শাহবাগের দিকে। বললেন, নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে। একটু সামনে গেলেই দেখতে পাবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি শাহবাগে থামল। আবার ট্রাফিক সিগনালে লালবাতি জ্বলে উঠেছে। রাস্তার দুই দিকের সব যানবাহন থেমে গেল। সামনে রাস্তাতেই চওড়া জায়গায় সাদা কালো রং করা। সেখান দিয়ে অনেক পথচারী রাস্তা পার হচ্ছেন। জামিল বললেন, ইজাজ দেখেছো, এখানে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া যায়। এটাকে বলা হয় জেব্রাক্রসিং। গতবার তোমরা চিড়িয়াখানায় জেব্রা দেখেছিলে। ওদের শরীরে কেমন সাদা কালো ডোরাকাটা আঁকা, মনে আছে? সে রকম দাগটানা বলে এ জায়গাগুলোকে জেব্রাক্রসিং বলে। ইজাজ অবাক হয়ে বলল, বাহ খুব মজার তো।

শিশুপার্কে অনেক কিছু দেখল সবাই। ইজাজ, ছবি, টিয়াকে জামিল ট্রেনে, ঘোড়ায়, নাগরদোলায় চড়ালেন। বেলুন, বাঁশি কিনে গাড়িতে ফিরে চলল ওরা। রমনা পার্কের পাশ দিয়ে একটু সামনে এগোল গাড়ি। রাস্তার এপার ওপার জুড়ে বেশ উঁচুতে একটা অনেক বড় বোর্ড। বোর্ডটি সবুজ রঙের, তাতে সাদা তীরচিহ্ন দিয়ে স্থানের নাম লেখা–

ওরা বাঁ দিকের রাস্তায় এগোল। মগবাজারের দিকে যাবে। একটু এগুতেই রাস্তার বাঁ পাশে একটা বোর্ড দেখতে পেল। তাতে তিন কোনা একটা লাল রঙে আঁকা বাক্স। বাক্সের ভেতরে দুটি ছেলেমেয়ে হাঁটছে। কাঁধে স্কুলের ব্যাগ। ছবিটির নিচে লেখা – সামনে স্কুল। ছবি সেটা দেখতে পেয়েই জোরে বলল, এটা কিন্তু চিনি। ফরিদপুরে আমাদের স্কুলের সামনে এ রকম দেখেছি। এখানে রিকশা, গাড়ি সাবধানে চলে। আর ট্রাফিক পুলিশ আমাদের রাস্তা পার হতে সাহায্য করেন।

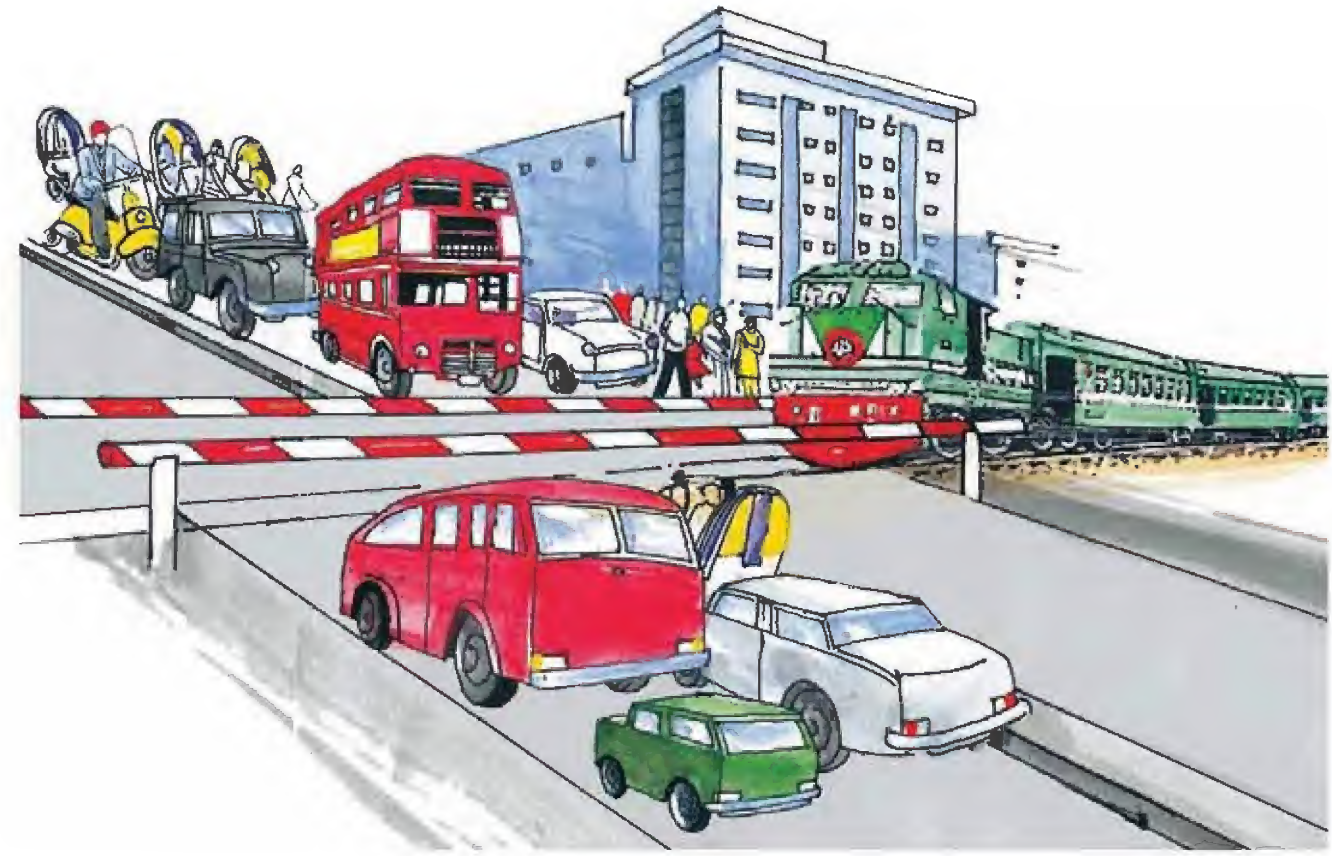

মগবাজার পেরোতেই একটানা ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। কান পেতে ইজাজ সেটা শুনল। তারপর জানতে চাইল, এটা কিসের শব্দ মামা? জামিল বললেন, সামনেই লেভেলক্রসিং। ছবি বলল, সেটা আবার কী মামা। জামিল বললেন, রেলপথ আর সড়ক যেখানে মেশে তাকে বলে লেভেলক্রসিং। লেভেলক্রসিংয়ে রাস্তার দুই পাশে গেট থাকে। রেলগাড়ি যাওয়ার সময় গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন দুই পাশের রাস্তায় যানবাহন থেমে থাকে। ঘণ্টা বাজছে শুনছো তো। রেলগাড়ি আসবে বলে একটু আগে থেকে তা বাজানো হয়। দু পাশের গাড়ি সতর্ক হয়। ঐ দেখো, রাস্তার দুই পাশে লম্বা দুটি লোহার পাইপ। তাতে লাল সাদা রং করা। এগুলো নেমে আসছে। রাস্তা বন্ধ করে দেবে। রেলগাড়ি চলে গেলে ওদুটো ওপরে তোলা হবে।

বলতে বলতেই ঝকঝক করে রেলগাড়ি ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। ছবি ও ইজাজ খুব আগ্রহ নিয়ে দেখল। রেললাইন পার হয়ে বেশ তাড়াতাড়ি তেজগাঁও ফ্লাইওভার চলে এলো গাড়ি। সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় খুব আনন্দ পেল ছবি, টিয়া, ইজাজ। তারপর তাড়াতাড়ি খামারবাড়িতে জামিলের বাসায় চলে এলো। মামিমা ও মা সকলের জন্য নাশতা সাজিয়ে বসেছিলেন। মা বাড়ি থেকে নারকেলের সন্দেশ এনেছেন। মামিমা রান্না করেছেন পায়েস ও চটপটি। মজা করে খাওয়া হলো। খেতে খেতে হাসাহাসি হলো। এক সময় ইজাজ বলল, ঢাকায় অনেক ভিড়। আমাদের ছোট শহরই ভালো, যখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাওয়া যায়।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

বার্ষিক	– বছর বিষয়ক। প্রতি বছরের শেষে হওয়া।	আগামী মাসে বার্ষিক পরীক্ষা হবে।
চৌরাস্তা	– চারটি রাস্তা মিলেছে যেখানে।	চৌরাস্তার ধারে আছে বড় একটা বটগাছ।
ব্রিজ	– সেতু। পুল।	গাঁয়ের রেলপথে খালের ওপর একটি রেলব্রিজ থাকে।
বোর্ড	– ফলক। রাস্তায় চলাচলের নিয়ম লেখা ফলক।	নিরাপদে পথ চলতে বোর্ডের নিয়ম মানা দরকার।
সরব	– শব্দ করে। আওয়াজ করে।	কবিতাটি সরবে পাঠ করি।
নির্দিষ্ট	– নির্ধারিত।	প্রতিদিন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বাস ছাড়ে।
নাগরদোলা	– এক রকমের দোলনা।	বৈশাখী মেলায় নাগরদোলায় চড়েছিলাম।
সতর্ক	– সাবধান।	সতর্ক হয়ে পথ চলো।

২. শব্দগুলো জেনে নিই।

শিশুপার্ক	– শিশুদের অনন্দ করার জায়গা।	শুক্রবারে চাচার সঙ্গে শিশুপার্কে যাব।
ট্রাফিক লাইট	– নিয়মমাফিক যানবাহন চলাচলের জন্য বাতি।	ট্রাফিক লাইট দেখে চলাচল করা নিরাপদ।
ফুটওভার ব্রিজ	– রাস্তার ওপরে পায়ে চলাচলের উঁচু সেতু।	শহরের রাস্তায় রাস্তায় অনেক ফুটওভার ব্রিজ আছে।
জেব্রাক্রসিং	– সাদা কালো দাগকাটা রাস্তা পারাপারের জায়গা।	জেব্রাক্রসিং দিয়ে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া যায়।
লেভেলক্রসিং	– রেলপথ ও সড়ক মেশার জায়গা।	রেলপথে অনেক লেভেলক্রসিং আছে।
ফ্লাইওভার	– উড়ালসেতু। রাস্তার ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের সেতু।	বড় বড় শহরে অনেক ফ্লাইওভার দেখা যায়।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

বার্ষিক	–	র্ষ	=	রেফ (র্)	+	ষ	বর্ষ, হর্ষ
পার্ক	–	র্ক	=	রেফ (র্)	+	ক	অর্ক, তর্ক
ফার্মগেট	–	র্ম	=	রেফ (র্)	+	ম	কর্ম, ধর্ম
ব্রিজ	–	ব্র	=	ব	+	র-ফলা (্র)	ব্রত, তীব্র
		ন্ধ	=	দ	+	ধ	বন্ধ, শুন্ধ
নির্দিষ্ট	–	ষ্ট	=	ষ	+	ট	নষ্ট, কষ্ট
		র্দ	=	রেফ (র্)	+	দ	ফর্দ, জর্দা
ঘণ্টাধ্বনি	–	ণ্ট	=	ণ	+	ট	কণ্টক, বণ্টন
		ধ্ব	=	ধ	+	ব	ধ্বজা, ধ্বংস
আগ্রহ	–	গ্র	=	গ	+	র-ফলা (্র)	অগ্র, গ্রহণ

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে লিখি।

(ক) জামিলের বাসা কোথায় ?

১) ফার্মগেট　　২) খামারবাড়ি

৩) শাহবাগ　　৪) মগবাজার

(খ) ট্রাফিক লাইটে সবুজ রং দেখা গেলে গাড়ি –

১) সম্পূর্ণ থেমে যাবে　　২) একটু পরে চলবে

৩) চলতে শুরু করবে　　৪) ডান দিকে যাবে

(গ) পায়ে হেঁটে সবচেয়ে নিরাপদে কীভাবে রাস্তা পার হওয়া যায় ?

১) জেব্রাক্রসিং দিয়ে　　২) ডানে বাঁয়ে দেখে

৩) ট্রাফিক নিয়ম মেনে　　৪) ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে

৪. আরও কিছু সংকেত চিনে নিই।

সামনে হাসপাতাল
ভেপু বাজানো নিষেধ

সাইকেল চলাচল
নিষেধ

চিঠি ফেলার বাক্স

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

(ক) ছবি ও ইজাজের ছোট মামার নাম কী ?
(খ) ছুটির দিনেও ঢাকার রাস্তায় ভিড় থাকে কেন ?
(গ) ট্রাফিক পুলিশ কীভাবে বৃদ্ধকে সাহায্য করলেন ?
(ঘ) রাস্তায় সাদাকালো দাগটানা জায়গাকে জেব্রাক্রসিং বলে কেন ?
(ঙ) লেভেলক্রসিং কী ?
(চ) ইজাজ ছোট শহরকে ভালো মনে করছে কেন ?

৬. ডান দিকের শব্দের সঙ্গে বাম দিকের শব্দের মিল করে খাতায় লিখি।

লালবাতি	পথচারী পারাপার
নাগরদোলা	ফ্লাইওভার
লেভেলক্রসিং	অনেক ভিড়
জেব্রাক্রসিং	নিরাপদে চলাচল
ঢাকা শহর	শিশুপার্ক
ট্রাফিক নিয়ম	যানবাহন থামা
	রেলগাড়ি চলা

৭. ছবি দুটি মনোযোগ দিয়ে দেখি। কী লেখা আছে বুঝে পড়ে সবাইকে শোনাই।

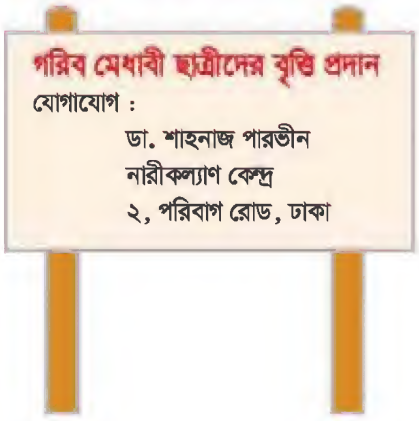

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৩-বাং

পরনিন্দা ভালো নয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত– বিক্রয়ের জন্য নয়।